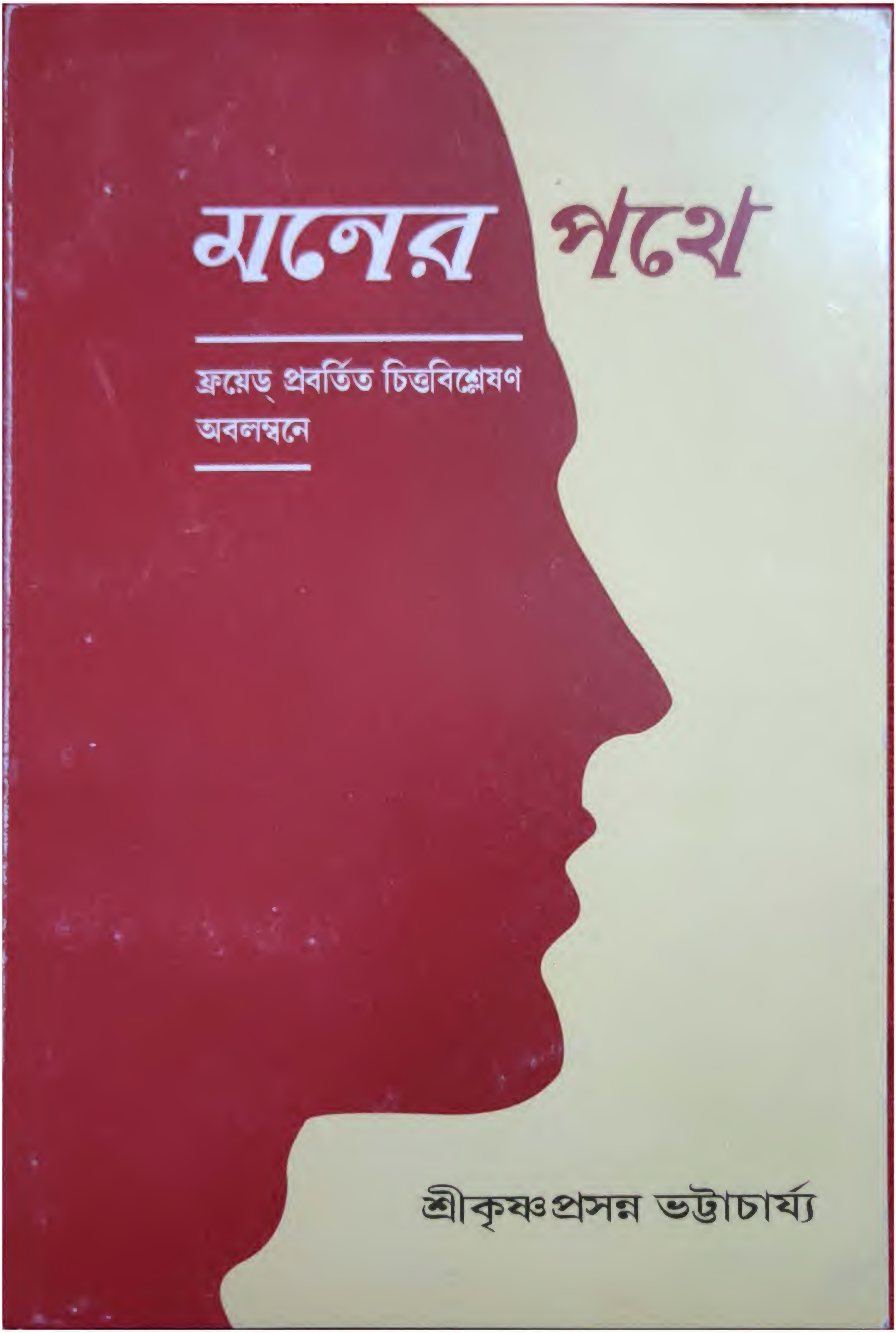

মনের পথে

ফ্রয়েড্ প্রবর্তিত চিত্তবিশ্লেষণ
অবলম্বনে

শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য

ভূমিকা

বহুকাল হইতে একটি কথা চলিয়া আসিতেছে যে মন স্বৈরগতি—বাহিরের বাঁধন মানে না। আমরা প্রত্যেকেই ভাবি—'আমার মন আমার নিজের অধীন।' এ কথাটি যে প্রমাণ-সাপেক্ষ, তাহা সহজ চিন্তায় আসে না অথচ, প্রতি পদেই দেখিতে পাই যে আমরা 'ভাবি এক, হয় আর'। যখন কাজ করিব বলিয়া কাগজপত্র লইয়া বসিলাম, মন বিষয়ান্তরে লিপ্ত হইল। বেড়াইতে যাইব বলিয়া বাহির হইলাম, বন্ধুর পাল্লায় পড়িয়া তন্ত্রশাস্ত্রের বক্তৃতা শুনিয়া আসিলাম। কবিতার বইখানা পড়িব বলিয়া কিনিয়া আনিলাম, মাথা ধরিয়া উঠিল, সব উৎসাহ নিভিয়া গেল। এই প্রকারে প্রতিনিয়তই দেখিতেছি যে আমাদের সুখদুঃখ ইচ্ছা-অনিচ্ছা নানা ঘটনা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়।

সাধারণতঃ মনের পাঁচটী নিয়ামক ধরা হয়, (১) জড় জগতের বস্তু-নিচয়, (২) মানুষের সঙ্গ বা সামাজিক সঙ্গ বা সামাজিক আবেষ্টনী, (৩) শরীরের অবস্থা, গঠন ও ক্রিয়া, (৪) মনের জাগ্রত চিন্তা ও ইচ্ছা-ধারা, (৫) অসংবিৎ চিত্ত-ধারা—যেগুলিকে এই বইখানিতে অব্যক্ত বলা হইয়াছে।

জড়জগৎ যে মনকে নিয়ন্ত্রিত করে তাহা সহজেই বোঝা যায়—বজ্রপাত হইল, সে শব্দ, আমি ইচ্ছা করি বা না করি, আমার মনকে জুড়িয়া বসিবেই। বসন্তকালে মানুষের যে ভাবের পরিবর্ত্তন হয়, কবিরা বহুদিন হইতেই তাহা বর্ণনা করিয়া আসিতেছেন। এইরূপে পর্ব্বত ও অরণ্য, সমুদ্র ও মরুভূমি মানুষের মনে ছাপ আঁকিয়া দেয়। গৌরীশঙ্কর অভিযানের যাত্রীরা অনেকেই বলিয়াছেন যে কয়েক হাজার ফিট্ উঠিবার পরেই মনের অবস্থা পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়।

মানুষের সঙ্গ ও বিভিন্ন সামাজিক আবেষ্টনীতেও এই প্রকার ভাব-পরিবর্ত্তন ঘটে; তাহার প্রমাণ সাধুসঙ্গ ও কু-সঙ্গের ফলাফল।

বাড়ীতে, অফিসে ও থিয়েটারে মনে যে অবস্থা-বিপর্য্যয় ঘটে, তাহাও মানুষের সঙ্গের প্রভেদে। সুস্থ শরীরে যে প্রকার চিন্তা ও ইচ্ছার উদয় হয়, অসুস্থ হইলে সেরূপ হয় না। কেহ বা এরূপ শরীরের গঠন লইয়া জগতে আসে যে তাহার স্নায়ুমণ্ডলী ও অন্যান্য অংশ স্বভাবতঃই বিকৃত অবস্থায় থাকে। এ সকল লোকের মনের গতিও অস্বাভাবিক হয়। জড় জগতের ও সমাজের আবেষ্টনী যদি অনুকূল না হয়, তাহা হইলে ইহাদের পক্ষে জীবন-যাপন করা অসম্ভব হয়। আমাদের চিন্তা ও ইচ্ছার ধারাও মনের পরবর্ত্তী অবস্থাকে নিয়ন্ত্রিত করে, ক্রোধ বা অন্য রিপুর উদয়ে বুদ্ধি-ভ্রংশ হয়। যাহাকে ঘৃণা করি তাহার দোষ নজরে পড়ে, যাহাকে ভালবাসি তাহার সবই ভাল মনে হয়। এই প্রকারে আমাদের মনের প্রত্যেক অবস্থা অপরটির সঙ্গে বাঁধা থাকে।

ইহা ব্যতীত, মনের অসংবিৎ ধারা যে মনের প্রত্যেক ভাবকে নিয়ন্ত্রিত করে, এ সত্যটি বহুদিন হইতেই জানা আছে। কিন্তু অষ্ট্রিয়ার মনস্বী অধ্যাপক ফ্রয়েড্, কি ভাবে অব্যক্ত জীবন জাগ্রত মনের পরিবর্ত্তন সাধন করে, তাহা সুস্পষ্টভাবে আমাদিগকে দেখাইয়া দিয়াছেন। প্রকৃতি দেবী মানুষকে কতকগুলি প্রবৃত্তি দিয়া জগতে পাঠাইয়াছেন, তাহাদের প্রেরণায় মানুষ নানা কর্ম্ম ও অকর্ম্মের পথে ধাবিত হয়।

যখন যে প্রবৃত্তি আমাদের জীবনে অবস্থার প্রতিকূল হয়, সেগুলির নিরোধ হয়। তাহাদের সাধারণ ক্রিয়া বন্ধ থাকে। জড়জগতে বা সমাজের আবেষ্টনীতে মানুষের সকল প্রবৃত্তির পূরণ কখনই হইতে পারে না। ঠিক যে সময়ে যে ইচ্ছা হইবে তাহার সম্পূর্ণ তৃপ্তি অসম্ভব। কাজেই, স্বভাবতঃই বহু প্রবৃত্তি বহু ইচ্ছা অপূর্ণ থাকিয়া যাইবে—তাহাদের নিরোধ হইবে। কিন্তু নিরোধ হইলেই তাহাদের লোপ হয় না।

গীতায় আছে—

কর্মেন্দ্রিয়াণি সংযম্য য আস্তে মনসা স্মরন্।
ইন্দ্রিয়ার্থান্ বিমূঢ়াত্মা মিথ্যাচারঃ স উচ্যতে।।

বাহিরের কাজ বন্ধ থাকিলেও অসংবিৎ অবস্থায় প্রবৃত্তির কাজ চলে এবং সময়ে "কার্য্যতে হ্যবশঃ কর্ম সর্বপ্রকৃতিজৈর্গুণৈঃ।" ফ্রয়েড্ দেখাইয়াছেন যে এই সকল নিরুদ্ধ প্রবৃত্তি আমাদের অব্যক্ত জীবনে গ্রন্থির সৃষ্টি করে ও নানা প্রকার ব্যাধির কারণ হয়। কেবল তাহাই নহে, আমরা নিজেদের যখন সুস্থ ও স্বাভাবিক মনে করি, তখনও এই সকল প্রবৃত্তির গ্রন্থি আমাদের মনের ধারাকে আলোড়িত করিয়া তোলে, এমন কি, উহার গতি পর্যন্ত পরিবর্ত্তন করিয়া দেয়।

ফ্রয়েডের চিকিৎসা-প্রণালীর সারতত্ব এই গ্রন্থির মূল অনুসরণ। গ্রন্থির নিরাসেই ব্যাধির উপশম হয়। এই উপায়ে মনের গূঢ় দ্বন্দ্ব ও অশান্তির নিরাকরণ আমাদের দেশে বোধ হয় সম্পূর্ণ নূতন নহে। সাধকদের জীবনের সহিত আমার যতটুকু পরিচয় আছে, তাহাতে মনে হয় যে তাঁহারা সাধনার পথে অগ্রসর হইবার পূর্বে এই প্রকার প্রবৃত্তি গ্রন্থিগুলির সঙ্গে বোঝা-পড়া করেন।

ফ্রয়েডের মতবাদ অনেকের নিকট অপ্রীতিকর ও অশ্লীলতাপূর্ণ মনে হইবে। সত্য যে ভাবেই আসুক, তাহা যদি সত্য বলিয়া প্রমাণিত হয়, তবে তাহাকে মানিয়া লইতেই হইবে। ইংরাজী ভাষায় ও অন্যান্য ইউরোপীয় ভাষায় Psycho-analysis সম্বন্ধে গত কয় বৎসরের মধ্যে বহুশত পুস্তক প্রণীত হইয়াছে। বাংলায় শ্রীযুক্ত গিরীন্দ্র শেখর বসু ও শ্রীমান্ রঙ্গীনচন্দ্র হালদার কয়েকটি তথ্যপূর্ণ প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। শ্রীযুক্ত সরসী লাল সরকার মহাশয়ও এ বিষয়ে একখানি বই লিখিয়াছেন।

কিন্তু এই নূতন বিদ্যার সত্যাসত্য আমাদের নুতন করিয়া যাচাই

করিয়া লইতে হইবে। সুতরাং, এ সম্বন্ধে যত আলোচনা হয়, ততই ভাল। কাজেই গ্রন্থকারের পুস্তকখানি সময়োপযোগী হইয়াছে। গ্রন্থকার সাধারণভাবে Psycho-analysis তত্ত্বগুলি প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন; এরূপ প্রয়াসেই পারিভাষিক শব্দের প্রয়োগ লইয়া অনেক সময়েই বিপদে পড়িতে হয়। বিস্তৃত বর্ণনার সাহায্যে গ্রন্থকার নিজের বক্তব্য সুস্পষ্ট করিয়া তুলিয়াছেন। যে সকল পরিভাষা ব্যবহৃত হইয়াছে সেগুলিও শোভন হইয়াছে। ফ্রয়েডের মতবাদ বর্ণনা করিতে হইলে যে সকল উদাহরণ দিতে হয় বা যে সকল তত্ত্বের উপর নির্ভর করিতে হয়, সেগুলি অনেক সময়ে বিসদৃশ বোধ হয়। মানসিক বিকারের চিকিৎসা হইতেই এই নূতন তত্ত্বের-উদ্ভব; সুতরাং উদাহরণগুলি অস্বাভাবিক মনে হওয়া আশ্চর্য্য নহে।

গ্রন্থকার পুস্তকখানিকে সুপাঠ্য ও সুরুচি-সঙ্গত করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। মনের ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়া, প্রবৃত্তির আত্মপ্রকাশ ও বিকৃতি সমস্তই লেখক বৈজ্ঞানিকের দৃষ্টিতে দেখিয়াছেন। এই মতবাদ ফ্রয়েড্ ও যাঁহারা তাঁহার অনুসরণ করেন, তাঁহাদের লেখা হইতেই অনেক স্থলে সংগৃহীত, সুতরাং মতবাদের নৈতিকতা সম্বন্ধে দায়িত্ব গ্রন্থকারের নহে। বইখানির মূলভিত্তি Psycho-analysis, কিন্তু লেখক নিজে স্বাধীনভাবে এ সম্বন্ধে যাহা বুঝিয়াছেন, সেই ভাবেই বিষয়টি বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। আশা করি, এ বিষয়ে নূতন পুস্তক বলিয়া যাঁহারা মনোবিদ্যার অনুরাগী বইখানিকে তাঁহারা আদরে গ্রহণ করিবেন।

কলকাতা
৮ই সেপ্টেম্বর,
১৯২৬।

শ্রীনরেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, পি-এইচ্, ডি,
(হাভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়)
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের
ব্যবহারিক মনোবিজ্ঞানের অধ্যাপক।

মুখবন্ধ

সরল ভাষায় আধুনিক মনোবিজ্ঞানের নূতন কয়েকটি কথা পাঠকবর্গের সম্মুখে ধরাই এই ক্ষুদ্র পুস্তকের উদ্দেশ্য। ফ্রয়েড, ষ্টেকেল, স্মিথ, বার্ণার্ডহার্ট প্রমুখ মনস্তত্ত্ববিদ্‌গণের ভাব অবলম্বন করিয়াই আমি এই ক্ষুদ্র গ্রন্থখানি প্রণয়ন করিয়াছি। পুরাণে আছে, ভগীরথ স্বর্গ হইতে গঙ্গা মর্তে আনয়ন করেন,—জেম্‌স্‌ ও ফ্রয়েড মনোবিজ্ঞানকে কল্পলোক হইতে নামাইয়া আনিয়া মানবের ব্যবহারিক জীবনে প্রয়োগ করিয়াছেন। সিগ্‌মুণ্ট ফ্রয়েড ভিয়েনা সহরে স্নায়বিক রোগের চিকিৎসা করেন। ত্রিশ বৎসরের অধিক হইল, তিনি চিত্ত-বিশ্লেষণের কথা প্রচার করিতেছেন। তাঁহার মতবাদ এতই নূতন ও যুগান্তকারী যে ইহার জন্য তাঁহাকে অনেক লাঞ্ছনা ও উৎপীড়ন সহ্য করিতে হইয়াছে। কিন্তু তাঁহার মৌলিকতা এতই অদ্ভুত যে এত সমালোচনা ও প্রতিকূলতা সত্ত্বেও বহু প্রতিভাবান্ ব্যক্তি তাঁহার মতবাদকে ভিত্তি করিয়া মনোজগতে কত নূতন তথ্য আবিষ্কার করিয়াছেন, দিকে দিকে এই নূতন মনোবিজ্ঞানের প্রসার বাড়িতেই চলিল। ফ্রয়েড্ আজ মানবজীবন-প্রবাহিনীর মূল উৎসে পৌঁছিয়া মনের অন্তস্তলের গোপন তথ্যের সংবাদ দিতেছেন। তিনি মানুষের নিদ্রা, স্বপ্ন, স্নায়ুবিকার ও উন্মত্ততার নূতন ব্যাখ্যা দিয়াছেন, আর শুধু মতবাদ প্রচার করিয়াই সন্তুষ্ট রহেন নাই, তাঁহার আবিষ্কৃত তত্ত্ব হইতে এমন এক চিকিৎসা-প্রণালীর উদ্ভাবন করিয়াছেন যাহাতে বহু রোগীর স্নায়বিক ও মানসিক বিকৃতি বিনা ঔষধে শুধু চিকিৎসকের সহিত আলাপ-ব্যবহারের মধ্য দিয়াই ধীরে ধীরে অপসারিত হইতেছে। বিগত মহাযুদ্ধে এই নূতন ব্যবহারিক মনোবিজ্ঞানের অগ্নি-পরীক্ষা

হইয়া গিয়াছে। কামানের গোলা ও বোমার আকস্মিক ভীষণ শব্দে এবং নানা দুশ্চিন্তায় বহু যোদ্ধার স্নায়বিক ও মানসিক বিকার ঘটিয়াছিল। তাহাদের অনেকেই ফ্রয়েড্-প্রবর্তিত চিত্তবিশ্লেষণ-পদ্ধতি অনুসরণ করিয়া আশাতীত ফল লাভ করিয়াছেন। তথাপি ফ্রয়েডের সব কথা সর্ববাদিসম্মত নয়। এড্লার, ইউঙ্গ প্রমুখ বিখ্যাত মনস্তত্ত্ববিদ্গণ এই নূতন বিজ্ঞানের সবখানি মানিয়া লয়েন নাই। ফ্রয়েডের নূতন তত্ত্ব একবাক্যে মানিয়া লওয়া দূরের কথা, নানা বাদানুবাদেরই সৃষ্টি করিয়াছেন। তথাপি বহু রোগী যে তাঁহার প্রণালী অনুসরণ করিয়া নীরোগ হইতেছে, এ কথা আজ কাহারও অস্বীকার করিবার সাধ্য নাই। কিন্তু দুঃখের বিষয়, ফ্রয়েডের মনোবিজ্ঞান আজও চিকিৎসকগণের মধ্যে আশানুরূপ বিস্তার লাভ করিল না। মানুষ গতানুগতিক, নূতন কোন সত্যকে গ্রহণ করিতে হইলে অনেকখানি সংস্কার-মুক্ত হওয়া আবশ্যক। এমন সুফল সত্ত্বেও যে এই ব্যবহারিক বিজ্ঞানের বহুল প্রসার এখনও হইল না, তাহার অন্যতম কারণ এই যে ইহার প্রয়োগে যেটুকু একাগ্রতা ও আত্মবিশ্লেষণ প্রয়োজন, তাহা সাধারণ চিকিৎসকগণের মধ্যে বিরল।

বর্তমান যুগের জটিল কর্মজীবনে অনেকেই দিশাহারা হইয়া পড়েন; তাই, জগতের সর্বত্রই স্নায়বিক ও মানসিক রোগের প্রাদুর্ভাব দেখা যাইতেছে। আজ ঘরে ঘরে দুর্বল ও রুগ্ন মন লইয়া থাকিয়াও বহুলোকই সুস্থ বলিয়া পরিগণিত হইতেছেন। বিনা ঔষধে স্নায়ু ও মনের ব্যাধি ও অশান্তি দূর করিবার ইহা এক অভিনব উপায়। আমাদের প্রাত্যহিক জীবনের কত পারিবারিক অশান্তি যে এই নুতন প্রণালী অনুসরণ করিলে দূর হয় ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়। দুষ্কর্ম-নিরত ও রিপুপরবশ মানবের কিছু না কিছু মানসিক বিকৃতি ঘটেই।

তাহাদের মনের পরিবর্তন সাধন করিতে এই নুতন মনোবিজ্ঞান অব্যর্থ। মানসিক দুর্বলতার জন্য ভাল হইবার, বড় হইবার ইচ্ছা থাকিলেও যাহাদের সামর্থে কুলাইতেছে না, এই বিজ্ঞান তাহাদের পরম বন্ধু। মনের তলদেশে উজ্জ্বল আলোক ফেলিয়া এই মনোবিজ্ঞান এক মহান্ ভবিষ্যতের সূচনা করিয়াছে।

আবার, আমরা গৌরবান্বিত বোধ করি, যখন দেখি ভারতীয় সাধনা ও সভ্যতারই বিশিষ্ট ধারা আজ প্রতীচ্যে ফ্রয়েড্প্রমুখ মনীষিগণের মধ্য দিয়া উদ্ভিন্ন হইয়া উঠিতেছে। ভারতের সনাতন আদর্শ যে মনোবিজ্ঞানের পাশ্চাত্য পদ্ধতির মধ্য দিয়া মূর্ত হইয়া উঠিতে চাহিতেছে, ইহা আমাদের পরম গৌরব এবং জগতের পরম লাভ। আজ পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের যুগোপযোগী পরিচ্ছদে ভূষিত হইয়া ভারতের চিরন্তন আদর্শ আবার আমাদের দ্বারে উপনীত। এবং হয়ত আমরা বুক ফুলাইয়া নির্লজ্জ স্পর্দ্ধায় ঘোষণা করিব—

"আমি চিনি গো চিনি তোমারে ওগো বিদেশিনি।"

গ্রন্থকার।

মনের পথে

প্রথম পরিচ্ছেদ

অব্যক্ত (Unconscious)

আমরা অদৃশ্য আলোকের কথা শুনিয়াছি—অশ্রুত শব্দের কথা জানি। এমন অনেক আলোক-রশ্মি আছে যাহা আমাদের চক্ষু ধরিতে পারে না, এমন কত শব্দ ধ্বনিত হইতেছে যাহা আমাদের কান শুনিতে পায় না। তেমনই, মনের এমন অব্যক্ত অংশ আছে যাহা আমাদের মন ধরিতে পারে না। মনের যে অংশটুকু সম্বন্ধে আমরা সচেতন শুধু সেইটুকু লইয়া মনোবিজ্ঞান এতদিন নাড়াচাড়া করিত। আজ আমরা দেখিতেছি—মনের চেতন অংশটি অজানার সমুদ্রের কয়েকটি তরঙ্গমাত্র, আর অগণিত তরঙ্গের বিক্ষোভ লইয়া অব্যক্ত মন সমুদ্রেরই মত অন্তরালে রহিয়াছে। আমরা প্রত্যেকেই অনুভব করি যে ক্রোধে আমরা জ্ঞান-হারা হই, লোভাতুর হইয়া বালকের মত আচরণ করি, অহংকারে আত্মবিস্মৃত হইয়া নির্বোধের মত ব্যবহার করি, কামার্ত হইয়া মনুষ্যত্ব হারাইয়া বসি; আবার জ্ঞান ফিরিয়া আসিলে বিস্মিত হই—কেমন করিয়া আমার দ্বারা এমন অদ্ভুত কর্ম সম্ভবপর হইল! কে যেন আমার মধ্যে প্রবেশ করিয়া আমাকে দিয়া এমন কাজ করাইল! আধুনিক মনোবিজ্ঞান বলিতেছে—তুমি ত জান না তোমার জাগ্রত মনের অন্তরালে কি রহিয়াছে, কত বিভৎস ইচ্ছা গোপন ভাবে তোমার মনের অজ্ঞাতভাগে নিহিত রহিয়াছে। মাঝে মাঝে তাহারা অকস্মাৎ জাগ্রত মনকে

অধিকার করিয়া তোমাকে আত্মহারা করিয়া ফেলে, তাই তুমি অমন অবশ হইয়া উন্মত্তের মত আচরণ কর। ঐ অব্যক্ত মনই অন্তরালে থাকিয়া তোমার জাগ্রত মনকে নিয়ত নিয়ন্ত্রিত করিতেছে।

এই অজানা অতলস্পর্শ মন এতদিন উপকথার রাজ-কুমারীর মত নিদ্রিত ছিল। চিত্ত বিশ্লেষকের সোনার কাঠির স্পর্শে আজ তাহা জাগিয়া উঠিতেছে। যিনি এই অজানা মনকে ধরিতে পারেন, তিনিই চিত্তবিশ্লেষক (Psycho-Analyst)। কি কি নিয়মে এই অব্যক্ত মন জাগ্রত মনের উপর ক্রিয়াশীল হয় তাহা নিরূপণ করা এই মনোবিজ্ঞানের মুখ্য উদ্দেশ্য; আর ঐ নিয়মের সাহায্যে মনের গোপন বিচিত্র ইচ্ছাগুলিকে জাগাইয়া তুলিয়া স্নায়ু ও মনের দুর্বলতা ও বিকৃতি দূর করিয়া স্বাস্থ্য ও শান্তি দান করাই চিত্তবিশ্লেষকের প্রধানতম উদ্দেশ্য।

এই ব্যবহারিক মনোবিজ্ঞান বলিতেছে সুস্থ ও বিকৃত মন একই নিয়মের অধীন। নিউটন যখন প্রথম বলিলেন—পাথর যে জলে ডুবে, আর বেলুন যে আকাশে ভাসে, তাহা একই বিশ্বনিয়মের দুই বিপরীত প্রকাশ; কোপার্নিকাস যখন প্রচার করিলেন—সূর্য ঘুরিতেছে দেখিতেছ বটে, কিন্তু পৃথিবীই সূর্যকে কেন্দ্র করিয়া ঘুরিতেছে,—মানুষের চিরবদ্ধ সংস্কার তখন নূতন সত্যের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়াছিল। আজ আবার চিত্ত-বিশ্লেষক বলিতেছেন—পাগলের মন যে নিয়মের বশবর্তী হইয়া প্রলাপ বকিতেছে, তোমার মনও সেই নিয়মের বশেই চলিতেছে। আবার তুমি পাগলকে পাগল বলিয়া বিদ্রূপও করিতেছ আর মনে ভাবিতেছ—আমি স্বাধীন ইচ্ছানুসারেই আমার জীবন নিয়ন্ত্রিত করিতেছি। আজ অনেকের

চিরাভ্যস্ত সংস্কারে আঘাত লাগিয়াছে, তাই চিত্তবিশ্লেষণের (Psycho-Analysis) বিরুদ্ধবাদীর সংখ্যাও বাড়িয়া উঠিতেছে। বৈজ্ঞানিক আসে তাহার নূতন অনুভূত সূক্ষ্ম সত্য লইয়া, আর জনসাধারণ চলিতেছে চিরপোষিত স্থূল সংস্কারগুলি মানিয়া লইয়া; সূক্ষ্ম সত্যগুলিকে অনুভব করিতে পারে না বলিয়াই তাহারা অস্বীকার করে, এমন কি, উপেক্ষা করে। তাই প্রতিভার সহিত সহজ স্থূল জ্ঞানের নিত্য স্বাভাবিক বিরোধ চলিতেছে।

⁂

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

মনের স্তর

আমরা ছেলেবেলায় ভূতের বাড়ির কথা শুনিতাম। তাহাতে কত রকমারি ভূত থাকে, তাহাদের আবার স্থূল দেহ নাই। আমাদের মন এমনই একটি চারতলা ভূতের বাড়ির মত। তাহাতে কত অশরীরী ভাব ভূতেরই মত সূক্ষ্ম দেহে পরস্পর জড়াজড়ি করিয়া বসবাস করিতেছে। চেতন (Conscious), উপচেতন (Subconscious), প্রাক্-চেতন (Pre-conscious) ও অচেতন (Unconscious)—মনের এই চারিটি স্তর আছে। সাধারণতঃ আমরা যে চিন্তা ও কর্ম করিয়া থাকি, তাহা মনের চেতন স্তর দিয়া। আর মনের যে ভাবগুলি সম্বন্ধে আমরা সচেতন থাকি না, অথচ ইচ্ছানুসারে যাহাদের সম্বন্ধে সচেতন হইতে পারি, সেইগুলির সমবায়ে মনের দ্বিতীয় স্তর গঠিত হয়। ইহাকে মনের উপচেতন স্তর (Sub-conscious layer) বলা হইয়াছে। একটা উপমা দিলে কথাটা সরল হইবে। অন্ধকার রাত্রে নদী বাহিয়া জাহাজ চলিয়াছে; সার্চ-লাইটের তীব্র আলোকে সামনের নদী ও প্রান্তর উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছে; নদী ও প্রান্তরের কিয়দংশ আমরা উজ্জ্বল আলোকে স্পষ্ট দেখিতে পাই, আবার আলোর পাশেই দেখি অন্ধকার। প্রান্তর ক্রমশঃ ঝাপ্সা হইয়া অদূরে নিবিড় অন্ধকারময় বনরেখার সহিত মিলাইয়া গিয়াছে। আবার জাহাজ যেই চক্ষু ঘুরাইল, অমনি অন্ধকার দিক্টাই উজ্জ্বল হইয়া ভাসিয়া উঠিল। আমাদের মন প্রান্তরের মত বিস্তীর্ণ, অথচ নদীরই মত সচল। আলোকিত অংশই যেন চেতন মন, আর বাকী অন্ধকারময় অংশ যাহাতে আমরা ইচ্ছানুসারে চেতনার আলোক ফেলিতে পারি, তাহাই মনের উপচেতন

স্তর। যে ভাবগুলি আমাদের স্মৃতিতে বর্তমান, ইচ্ছা করিলেই যাহাদের আমরা মনে আনিতে পারি, অথচ যাহারা সর্বদা চেতন মনে থাকে না—সেই ভাবগুলি মিলিয়াই উপচেতন স্তর সৃষ্টি করিয়াছে। চেতন ও উপচেতন এই দুই স্তরের সমস্ত ভাবগুলি লইয়া আমাদের জাগ্রত মন।

আবার, কতকগুলি ভাব আমরা নিয়তই ভুলিয়া যাইতেছি, অতীত জীবনের কত ভাব আজ বিস্মৃতির অতল গর্ভে ডুবিয়া গিয়াছে, কিন্তু উহারা ধ্বংস হইবার নহে; ঐ ভাবগুলি মিলিত হইয়া ধীরে ধীরে মনে একটি স্তর রচনা করিয়াছে। এই স্তরের ভাবগুলি পূর্বে চেতন স্তরে ছিল, তাই এই স্তরটিকে মনের প্রাক্‌চেতন স্তর (Pre-conscious layer) বলা যায়। আমাদের অতীত জীবনের কত কথা এই প্রাক্-চেতন স্তরে সঞ্চিত রহিয়াছে; আর সম্পূর্ণ ইচ্ছাধীন না থাকিলেও সুবিধা পাইলেই হঠাৎ কোন সামান্য কারণেই ঐ ভাবগুলি চেতন মনে ভাসিয়া উঠিতেছে।

আবার আমাদের জ্ঞানের উন্মেষের পূর্বেই অতি শৈশবাবস্থায় বহু সংস্কার গঠিত হয়। কেহ কেহ বলেন ভ্রূণাবস্থার, এমন কি, পুরুষ-পরম্পরাগত কত সংস্কার আমাদের মনে সঞ্চিত রহিয়াছে; এই সস্কারগুলি মনের নিম্নতম স্তর রচনা করিয়াছে; আমরণ এই স্তূপীকৃত সংস্কাররাশি মনের তলায় ডুবিয়া থাকে; যদি বা কখনও ভাসিয়া উঠে, তাহাদের আর চিনিবার উপায় থাকে না। তাই, মনের এই স্তরকে অচেতন স্তর বলা হইয়াছে। প্রাক্-চেতন ও অচেতন এই দুই স্তরের সমস্ত ভাব লইয়া আমাদের অব্যক্ত মন। প্রায়ই আমরা অচেতন স্তরের কোন খবর জানি না—জানিতে পারি না, কারণ স্বাধীন ইচ্ছায় এই স্তরের কোন সংবাদ আমরা পাইতে পারি না। যদি বা কখনও অচেতন স্তর হইতে কোন ভাব স্বতঃই জাগিয়া উঠে,

তখন বিস্মিত হই; ভাবি—এ কেমনতর ভাব আমার মনে কোথা হইতে আনাগোনা করিতেছে! ধারণাই করিতে পারি না যে আমারই সুদূর অতীত জীবনের ভাবগুলি আজ হঠাৎ ছাড়া পাইয়া জাগ্রত মনে ভাসিয়া উঠয়াছে।

আমরা দেখিলাম, মনের চারিটি স্তর সমস্ত জীবনের অভিজ্ঞতা, অনুভূতি, ভাব ও সংস্কার লইয়া কেমন নিয়ত চঞ্চল। জন্মাবধি রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ, স্পর্শের মধ্য দিয়া আমাদের জীবনে বিচিত্র অভিজ্ঞতা কেমন স্তরে স্তরে সুবিন্যস্ত হইয়া রহিয়াছে।

প্রথমেই আমরা ভূতের কথা বলিয়া আরম্ভ করিয়াছি। মাঝে মাঝে মনের তলার সূক্ষ্ম ভূতগুলি জাগ্রত মনে ভাসিয়া উঠে। আমাদের মুদ্রাদোষগুলি ঐ ভূতেরই উৎপাত ছাড়া আর কিছু নয়। প্ল্যাঞ্চেটে অনেকেই ভূত আনিয়াছেন বা আনিতে দেখিয়াছেন; তাহা আর কিছুই নয়—মনের তলার এই সূক্ষ্ম ভাবগুলি জাগিয়া উঠিয়া মাথা হইতে স্নায়ু-তন্ত্রী দিয়া হাতে নামিয়া আসে, আর আমাদের অজ্ঞাত ভাবে হাত দিয়া প্ল্যাঞ্চেট ঘুরাইতে ঘুরাইতে নানা কথা লিখিতে থাকে। অনেক ভূতে-পাওয়া রোগীর অদ্ভুত লক্ষণগুলি তাহাদের মনের তলার কতকগুলি বিকৃত ভাবের প্রকাশ মাত্র। আমরা অজ্ঞতাবশতঃ মনে করি—বাহির হইতে কোন প্রেতাত্মা আসিয়া আমাদের উপর ভর করিল। কিন্তু আমরাই ভোলানাথের মত কত রকমারি সূক্ষ্ম ভূত লইয়া বাস করিতেছি, তবে তাঁহার মত আমরা উহাদের বশে আনিয়া ভূতনাথ হইতে পারি নাই।

এইবার আমরা প্রাত্যহিক ভুল ভ্রান্তির রাজ্যে প্রবেশ করিয়া ভোলানাথের ঝোলাঝুলি ঝাড়িয়া দেখি—আর কি নূতন তথ্য সংগ্রহ করিতে পারি।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

ভুল ভ্রান্তি

ধরুন, আমি আপনার নামটি বেমালুম ভুলিয়া গিয়া 'ওর নাম কি, ওর নাম কি' বলিয়া একটা উৎপাতের সৃষ্টি করিয়াছি, অথচ আপনি আমার চির-পরিচিত প্রাণের বন্ধু। আপনি আবার কাহারও সহিত দেখা করিতে গিয়া ভুল করিয়া ছাতাটি ফেলিয়া আসিয়াছেন, রাস্তায় বৃষ্টি নামিতেই ছাতার কথা মনে পড়িল, আর অমনি যে বাড়িতে ছাতাটি ফেলিয়া আসিয়াছেন সেই দিকে উর্দ্ধশ্বাসে দৌড় দিলেন। এমনই করিয়া আমরা অনেক সময়ে একটা কাণ্ড বাধাইয়া বসি। আপনার কোন বন্ধুর হয়ত হঠাৎ এমনই ভোলা-মন হইল যে তিনি অহরহ জিনিস-পত্র কোথায় রাখিতেছেন মনেই থাকিতেছে না, ভুলিয়া গিয়া বাড়ি শুদ্ধ তোলপাড় করিয়া তুলিতেছেন। আপনার আর-এক বন্ধুর চিঠি আসিয়াছে; পড়িয়া দেখুন—বন্ধুটি চিঠিতে এতই ভুল করিয়াছেন ও কথা বাদ দিয়াছেন যে অতি কষ্টেও হয়ত চিঠিখানির অর্থ উদ্ধার করিতে পারিয়াও পারিলেন না, বাধ্য হইয়া আর-এক জনের কাছে দৌড়াইতে হইল। আবার আপনিও হয়ত এমন, যে দৌড়াইয়া কোন প্রতিবেশীকে চিঠি দেখাইতে গিয়া মনে পড়িল—আহা, তাইত! চিঠিখানাই ত ভুল করিয়া ফেলিয়া আসলিাম! এমনই আমরা অনেক সময়ে ভুল করি, ভুল শুনি, ভুল পড়ি; হয় কাহাকেও কথা দিয়া ভুলিয়া বসিয়া থাকি, নয় কাহাকেও চা খাইবার নিমন্ত্রণ করিয়া সারাদিন বাটীতে থাকিয়া ঠিক তাহার আসিবার সময়েই ভুলিয়া বাটী হইতে বাহির হইয়া পড়ি।

এখন স্বভাবতঃই প্রশ্ন উঠে যে এই ভুলগুলি আমরা করি কেন?

আমরা হয়ত একবাক্যে বলিয়া উঠিব—ইহা আমাদের কাহারও ইচ্ছা নয় যে বন্ধুটির নাম ভুলিয়া যাই, বা পয়সা-দিয়া-কেনা ছাতাটি হারাইয়া আসি, অথবা বন্ধুকে কথা দিয়া অপদস্থ করিবার জন্য বাহির হইয়া পড়ি। কিন্তু অনিচ্ছা সত্ত্বেও এই সব ভুল ভ্রান্তির আপদ আসিয়া জুটেই বা কোথা হইতে? ইতিমধ্যেই হয়ত পাঠক চটিয়া উঠিয়াছেন, ভাবিতেছেন "এ গুলির আবার কারণ থাকিবে কি? এই সব সামান্য ব্যাপারেরও আবার কারণ থাকিতে হইবে নাকি!" কিন্তু সামান্য হইলেও বৈজ্ঞানিকের সামান্য লইয়াই কারবার। আপেল ফল গাছ হইতে পড়িল; ব্যাপারটা সামান্য, কিন্তু নিউটন দেখিতে পাইলেন—যে আকর্ষণে আপেল মাটিতে পড়িতেছে, সেই আকর্ষণেই চাঁদ পৃথিবীর টানে বাঁধা পড়িয়াছে, পৃথিবী সূর্যকে কেন্দ্র করিয়া ঘুরিতেছে। তাই, এই ভুল-ভ্রান্তিগুলিকে উপেক্ষা করিয়া উড়াইয়া দিলে আমরা জড় বুদ্ধিরই পরিচয় দিব।

কেহ হয়ত বলিবেন—এই সামান্য ভুল ভ্রান্তি আমাদের তখনই ঘটে যখন আমাদের শরীরটা দুর্বল থাকে। ধরুন, আমি অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছি, কিংবা কোন কারণে আমার মানসিক উত্তেজনা, ক্লান্তি বা অবসাদ আসিয়াছে। তখন ঐ দুর্বলতার জন্য কিছু-না-কিছু ভুল-ভ্রান্তি স্বাভাবিক। তখন হয়ত ঘটিটা আনিতে গিয়া ভুলিয়া বাটিটা লইয়া আসিতেছি, হরেন বলিতে গিয়া ভুলিয়া নরহরি বলিয়া ফেলিতেছি। হইতে পারে শারীরিক অসুস্থতা ভুলের সহায়তা করে, কিন্তু মনের কোন গূঢ় কারণ না থাকিলে হরেনকে নরহরি বলিয়াই বা ডাকিব কেন, অন্য কত নামই ত আছে? আর আমরা দেখিতে পাই শরীর বেশ সুস্থ থাকিলেও আমরা অনেক সময়ে কত ভুল করি। কেহ বলিবেন—হরেন কথাটির সহিত নরহরি কথাটির অন্য কোন কথা

অপেক্ষা সৌ-সাদৃশ্য অধিক; কেহ বলেন—আমরা যখনই অবসন্ন হইয়া পড়ি, তখন কথা বলিতে গিয়া বক্তব্য বিষয় বলিতে বলিতে ইচ্ছার শিথিলতার জন্য একটা কথার সূত্রে তাহার সদৃশ যে কথাটা স্বতঃই মনে উদিত হয় তাহাই বলিয়া ফেলি, বক্তব্য কথাটি আর বলা হয় না। এমনই করিয়া আমরা একটা কথা বলিতে গিয়া ভুলে আর একটা কথা বলিয়া বসি।

ফ্রয়েড্ বলিতেছেন—ও-সব ত আছেই, সবই মানিয়া লইতেছি, কিন্তু সবটার মূলে আরও কিছু আছে। আমরা যত ভুল ভ্রান্তি করি—সমস্তই দুই বিরুদ্ধ ইচ্ছার টানে পড়িয়া। অনেকে হয়ত লক্ষ্য করিয়াছেন কেমন একটা দ্বিধা আসিয়া আমাদের ভুল ভ্রান্তি ঘটাইয়া দেয়। যখনই দুই বিপরীত ইচ্ছা দেখা দেয়, মন তখন কোন্‌টা করিবে ঠিক পায় না, সন্দেহে দুলিয়া উঠে, আর তখনই আমরা ভুল করিয়া বসি।

যখন বন্ধুটির নাম মনে পড়িতেছে না, কিছুতেই মনে আসিতেছে না, তখনই বুঝিব—ঐ বন্ধুর সহিত অপ্রীতিকর কিছু ঘটিয়াছে; তাই, কিছুতেই তাহার নাম পর্যন্ত মনে আনিতে ইচ্ছা হইতেছে না। একটু চিন্তা করিলেই মনে পড়িবে—হয়ত কয়েক দিন হইল, তাহার সহিত একবার মনোমালিন্য ঘটিয়াছিল। আবার ছাতাটি পয়সা দিয়া কিনিয়াও হয়ত আপনার পছন্দ-সই হয় নাই, কিংবা ছাতাটি বহন করা আপনার কাছে বিরক্তিকর বোধ হয়; তাই ওটিকে ভুলিয়া ফেলিয়া আসেন। আবার খুঁজিয়া দেখুন—মনের কোন কোণে হয়ত বন্ধুর প্রতি একটু ঈর্ষা বা বিদ্বেষ লুকাইয়া ছিল; তাই, অন্তরে তাহাকে খাওয়াইতে ইচ্ছা না থাকিলেও ভদ্রতার খাতিরে নিমন্ত্রণ করিয়া ঐ বিদ্বেষের বিরুদ্ধ টানেই তাহার আসিবার সময়েই বাহির হইয়া

পড়িলেন। ঐ বিরুদ্ধ ইচ্ছা কিছুতেই আপনাকে বাড়িতে থাকিতে দিল না—আপনি ভুল করিয়া বসিলেন।

এমনই আপনার ভোলানাথ বন্ধুটির খোঁজ করিলে দেখিবেন, হয়ত সেদিন তাহার শ্বশুরালয়ে যাত্রা করিবার কথা ছিল; অত্যন্ত অনিচ্ছা-সত্ত্বেও অফিসের দায়ে রহিয়া গিয়াছেন, আর ঐ অনিচ্ছার বিপুল টানে তাহার সমস্ত কাজই কেমন ভুলে ভ্রান্তিতে বেতালা হইয়া পড়িতেছিল। আবার তিনি অফিসে পৌঁছিয়াই এক চিঠি পাইলেন; পড়িয়া দেখিলেন—"তোমার আর আসা নিষ্প্রয়োজন, মায়াকে আজ পাঠিয়ে দিলাম, কাল তা'রা গিয়ে তোমার ওখানে পৌঁছিবে।" চিঠিখানি শ্বশুরালয় হইতেই আসিয়াছে; বলা বাহুল্য, মায়া আপনার বন্ধুটির সহধর্মিণী। যেই চিঠি পাওয়া, অফিসের কাজ এমন দ্রুত, নির্ভুল চলিতে লাগিল যে তিনি নিজের কৃতিত্বে নিজেই অবাক্ হইয়া গেলেন। এখানে স্পষ্টই দেখিতেছি—অনিচ্ছার সঙ্গে-সঙ্গে ভুল ভ্রান্তিও দূর হইল।

অনেকে হয়ত কথাটাকে তেমন আমল দিতেছেন না; ভাবিতেছেন—অনিচ্ছাই যদি থাকে, তবে ভুল করিতে যাইব কোন বুদ্ধিতে, কাজটা একেবারে না করিলেই হয়? ইচ্ছা না থাকিলে বন্ধুকে নিমন্ত্রণই বা করিতে গেলাম কেন, আর নিমন্ত্রণ করিয়া ভুলিয়াই বা বাহির হইয়া পড়িব কেন? আর সব-চেয়ে অদ্ভুত কথাটা এই যে ইচ্ছাই যদি না থাকিবে ত সেটা আমার তখন জানা নাই কেন,—সেটা এত কষ্ট করিয়াই বা বুঝিতে হইতেছে কেন?

কিন্তু একটু লক্ষ্য করিলেই দেখিতে পাই, একটা মাত্রা ছাড়াইয়া উঠিলেই ভুল ভ্রান্তিগুলি ধর্তব্যের মধ্যে আসিয়া পড়ে; তখন উহাদের আমরা অপরাধ বলিয়া গণ্য করি। পুস্তকাগার হইতে বই আনিয়া

যখন চেষ্টা করিয়াও ফিরাইয়া দিতে বার বার ভুলিয়া যাই, তখন ঐ ভুল অপরাধে পরিণত হয়, আমাদের দন্ড দিতে হয়। হয়ত বইখানা পড়িয়া এতই ভাল লাগিয়াছে যে ফিরাইয়া দিতে ইচ্ছা হইতেছে না। হয়, বইখানা ফেরৎ দিতে ভুলিয়া যাইতেছি, না-হয় কিছুতেই খুঁজিয়া পাইতেছি না। আমার অনিচ্ছাই অন্তরালে থাকিয়া আমাকে দিয়া এমন করাইতেছে। এমনই কেহ টাকা গচ্ছিত রাখিলে তাহা ফেরৎ দিতে বার বার ভুলিয়া গেলে বা হারাইয়া ফেলিলে সেটা হয় অপরাধ, গুরুজনকে দেখিয়া পদধূলি লইতে ভুলিয়া গেলে সেটা হয় অপরাধ, পিতার নাম কেহ জিজ্ঞাসা করিলে হঠাৎ ভুলিয়া গেলে সেটা হয় অপরাধ, স্কুলে যাইতে মনে না থাকিলে সেটাও অপরাধ বলিয়াই পরিগণিত হয়। আর ফিরাইয়া দিবার অনিচ্ছা, সম্মান প্রদর্শনে অনিচ্ছা, পিতার প্রতি বিদ্বেষ ও অশ্রদ্ধা এবং কর্তব্য কর্মে অনিচ্ছা এই সমস্ত ভুলের মধ্য দিয়া অলক্ষিতে প্রকাশ হইয়া পড়ে, তাই স্বভাবতঃই ঐ ভুল-ভ্রান্তি গুলি আমরা অপরাধ শ্রেণীভুক্ত করিয়া লই।

ঐ অনিচ্ছাটা সম্বন্ধে কখনও আমরা সচেতন থাকি, আবার কখনও ঐ অনিচ্ছাটা আমরা লক্ষ্য করিতে পারি না। মনের তলা হইতে বিপরীত ইচ্ছাটা হঠাৎ জাগিয়া উঠিয়া কথায় কাজে ভুল ভ্রান্তি আনিয়া দেয়, সেগুলির কারণ আমরা অনেক সময়েই বুঝিয়া উঠিতে পারি না। যখনই কোন ইচ্ছা অশোভন ভাবিয়া মনে চাপিয়া রাখি, তখনই এমন ভুল ভ্রান্তি ঘটিবার সম্ভাবনা। তখন ঐ ইচ্ছা প্রায়ই আমার বশে থাকে না, হঠাৎ কোন অপ্রত্যাশিত কারণে কখন-কখন উহা আমার মনকে আবিল করিয়া তুলে—তাই, আমাদের ভুল ভ্রান্তি ঘটিতে দেখা যায়।

আমরা দেখিলাম সমস্ত ভুল ভ্রান্তির কারণ আমাদেরই ইচ্ছা। আমিই ইচ্ছা করিয়া ভুল করি, ভুলিয়া যাই, অথচ সব সময়ে নিজেই বুঝিয়া উঠিতে পারি না। কোথাও কোন কাজে বাহির হইতেছি, হয়ত পড়িয়া গেলাম বা কোন কিছু লইতে ভুলিয়া গেলাম, বাধা পড়িল—অশুভ যাত্রা বলিয়া অনেকেই তখন যাওয়া বন্ধ করি। ইহারও মূলে কোন প্রতিদ্বন্দ্বী ইচ্ছা আছে, তাই, এমন ঘটিল, দ্বিধা আসিল, বাধা পড়িল, ভুল হইল। তাই, কাজের সফলতাও ঐ যাত্রার মধ্য দিয়া কথঞ্চিত আভাসে সূচিত হয়। পাঠক হয় ত ভাবিতেছেন—ভাল রে ভাল, শেষে আমাদের কুসংস্কারগুলিই এই বিজ্ঞান সমর্থন করিতেছে নাকি! এত কষ্টে যাহাদের হাত এড়াইয়া উঠিয়াছি, এখন আবার বাধা, হাঁচি, টিক্‌টিকি, তিথি, নক্ষত্র পর্যন্ত মানিয়া চলিতে হইবে নাকি? প্রত্যুত্তরে আমি বলিতেছি মা ভৈঃ! যাহার মধ্যে সত্য আছে বুঝিব, তাহা না মানাই ত কুসংস্কার। আবার কোনটা সত্য বলিয়া সবই যে অন্ধের মত মানিয়া লইতে হইবে এত বড় কুসংস্কারই বা আর কী হইতে পারে!

⁂

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

গ্রন্থি (Complex)

কোন যুবক কোন যুবতীর প্রতি আসক্ত হইয়াছে। ঐ যুবতীকে কেন্দ্র করিয়া কত দিনের কত স্মৃতি, কত নিশীথ রাত্রির নিভৃত চিন্তা যুবকটির মনে গ্রথিত হইয়া উঠিয়াছে। যুবকের হৃদয়াবেগে রঞ্জিত হইয়া এই ভাবগুলি যুবতীকে কেন্দ্র করিয়া তাহার মনে একটি (Complex) সৃষ্টি করিবে। এই বিজ্ঞানের পরিভাষায় বলা যায়—ঐ যুবকটির মনে নারী-গ্রন্থি (Female Complex) গড়িয়া উঠিয়াছে। ঐ গ্রন্থির ভাবগুলি অহরহ তাহার মনে জাগিয়া উঠিতেছে। যুবকটির মনের সমস্ত শক্তি সংহত হইয়া ঐ রমণীকে কেন্দ্র করিয়া বিচিত্র কল্পনার ইন্দ্রজাল রচনা করিতেছে। সে আর কিছুতেই কোন কাজে মন দিতে পারে না, দিনের কাজ তাহার কাছে রসহীন বলিয়া বোধ হয়; বিশ্বের প্রত্যেকটি বস্তু, প্রত্যেকটি ঘটনা তাহার প্রিয়ার প্রতীকের মতই সে দেখে, যে দিকে দৃষ্টি পড়ে—তাহার প্রেমাস্পদই জাগিয়া উঠে। এমনই আবেগময় কতকগুলি প্রত্যয় কোন ব্যক্তি, বস্তু বা ঘটনাকে কেন্দ্র করিয়া পরস্পর-সম্বদ্ধ হইয়া মনে গ্রন্থির পর গ্রন্থি সৃষ্টি করিতেছে। গৃহকে কেন্দ্র করিয়া স্বজনের প্রতি আসক্তি লইয়া মনে গৃহ-গ্রন্থি (Home Complex) গড়িয়া উঠিয়াছে; শিশুর মনে তাহার মা-কে কেন্দ্র করিয়া কতকগুলি ভাব সংহত হইয়া উঠে; ঐ ভাবগুলিই তাহার মনে মাতৃ-গ্রন্থি (Mother Complex) রচনা করিয়াছে। আমাদের মন এমনই গ্রন্থির পর গ্রন্থি সৃষ্টি করিয়া চলিয়াছে। ইহারাই আমাদিগকে কর্মে ও চিন্তায় প্রবৃত্ত করিতেছে। গ্রন্থিগুলি স্বভাবতঃ নিষ্ক্রিয় থাকে, কিন্তু বাহিরের কোন ঘটনা বা

অন্তরের কোন ভাবকে অবলম্বন করিয়া ঐ গ্রন্থিগুলি ধীরে ধীরে ক্রিয়াশীল হইয়া উঠে, এবং উহাদের অনুরূপ চিন্তায় ও কর্মে আমাদের নিয়োজিত করে।

আমাদের মনে এমন কত না গ্রন্থি আছে। কোনটা প্রীতিকর কোনটা অপ্রীতিকর, কোনটা ক্ষীণ দুর্বল, কোনটা আবার তীব্র আবেগময়; কতকগুলি আমরা জানি, আবার কাহারও বা অস্তিত্ব ও ক্রিয়া আমরা বুঝিয়া উঠিতে পারি না। কেহ ঐ গ্রন্থিগুলির অস্তিত্ব ধরাইয়া দিলেও আমরা অনেক সময়ে উহাদিগকে স্বীকার করিতে চাই না।

আবার, শুধু যুক্তি বা চিন্তা আমাদের কর্মে প্রবৃত্ত করিতে পারে না; নীরস যুক্তির সঙ্গে এমন কোনও আবেগ থাকে না যাহাতে কর্মের প্রেরণা আনিয়া দিতে পারে। যেমন পূর্বোক্ত যুবকটি কত নারী দেখিয়াছে, তাহাদের সহিত দৈনন্দিন সহজ ব্যবহারও চলিতেছে, কিন্তু তাহার মনে তাহাদের জন্য আত্মোৎসর্গের কোন প্রেরণা নাই। কিন্তু ঐ বিশেষ যুবতীকে দেখিয়া তাহার মনের ভাবগুলি এমনই রঙ্গিন হইয়া উঠিল, যাহার প্রেরণায় সে তাহার রূপে বিভোর হইল—গুণে মুগ্ধ হইয়া তাহাকে দেবী বলিয়া বরণ করিল—তাহার জন্য আত্মবলি দিল।

মনের সাধারণ ভাবগুলি কোন বস্তু, ব্যক্তি বা ঘটনাকে কেন্দ্র করিয়া যে-পর্যন্ত আবেগময় হইয়া না উঠে, ততক্ষণ তাহারা আমাদের কর্মে প্রবৃত্ত করিতে পারে না। এ ভ্রান্ত ধারণা হয়ত আমাদের অনেকেরই আছে যে যুক্তি বিচার করিয়াই আমরা কর্মে ও চিন্তায় প্রবৃত্ত হইতেছি, কিন্তু একটু আত্মবিশ্লেষণ করিলেই বুঝি ঠিক তাহার বিপরীত। ধরুন আমি স্ত্রৈণ, এই বিজ্ঞানের ভাষায় আমার স্ত্রী-গ্রন্থি

(Wife Complex) আছে; এখন কেহ হয়ত গোপনে আমার স্ত্রীকে কিছু বলিতেছে শুনিয়াই তাহাকে সন্দেহ করিলাম; মনে অমনি গ্রন্থি ক্রিয়াশীল হইল—তাহাকে অসভ্যের মত গালাগালি দিলাম, হয়ত বা প্রহার করিতেই উদ্যত হইলাম। গ্রন্থির বশে অবশের মত সব করিয়া ফেলিলাম, কোন কিছু বিচার করিবার অবসর পাইলাম না। কিন্তু যখন অপেক্ষাকৃত শান্ত হইলাম, তখন চিন্তার উদয় হইল, ভাবিলাম—অন্যায় করিলাম না ত? আমরা মনে করি আমরা বুদ্ধিমান, বিচারশীল; শুধু প্রবৃত্তি আমাদের নাকে দড়ি দিয়া কাজ করাইতেছে, আর যুক্তি বিচার দিয়া আমরা কাজটা সমর্থন করিতে পারি না—মন ইহাতে কিছুতেই সায় দিতে চায় না, কেমন একটা অস্বস্তি বোধ করে। তখন ধীরে ধীরে যুক্তি বিচার গড়িয়া তুলিলাম, নানা রকমে ঘুরাইয়া ফিরাইয়া নিজের ব্যবহারকে সমর্থন করিলাম; হয়ত বলিলাম,—"এমন না করিলে তোমার আক্কেল হয়! স্ত্রীলোকের প্রতি ব্যবহার করিতে জান না, তাই, শিখাইয়া দিলাম। আমি যে বিশেষ একটা রাগিয়াই এমন করিলাম তাহা নয়, পরে বুঝিতে পারিবে—তোমার আজ কতখানি উপকার করিলাম।"

তখন যদি কেহ আমাকে ধরাইয়া দেয়, যে আমার স্ত্রীর প্রতি অন্ধ আসক্তিই ঐ অভদ্র ব্যবহারের মূল কারণ, তখনই আবার চটিয়া লাল হইয়া উঠিব। কোন মন্দ গ্রন্থি থাকিলে তাহার প্রধান লক্ষণই এই যে আমরা তাহার অস্তিত্ব উপলব্ধি করা দূরের কথা, বরং রাগিয়া অস্বীকার করিয়া বসি; ঐ গ্রন্থিটাই আমাদের বিচার বুদ্ধি বিকৃত করিয়া দেয়।

এমনই করিয়া আমরা প্রবৃত্তির অনুকূল যুক্তি বিচারের আশ্রয় লই। প্রাত্যহিক জীবনে আমরা এমনই দেখিতেছি। অভ্যাস ও

লোকাচারের বশবর্তী হইয়া আমরা স্বতঃই সহজ প্রবৃত্তিবশে কাজ করিয়া যাইতেছি, চিন্তা করিতেছি। কিন্তু নিজের ও পরের কাছে একটা জবাবদিহি দিতে হইলেই আমাদের কাজকে সমর্থন করিতে যাইয়া যুক্তি-বুদ্ধির অবতারণা করিয়া বসি। আবার যুক্তি ও কাজে কোথাও গরমিল হইলে যুক্তিকেই কাটিয়া ছাঁটিয়া বিকৃত করিয়া কাজের সঙ্গে খাপ খাওয়াইতে চেষ্টা করি; প্রবৃত্তিগুলি যেমন ছিল তেমনই থাকিয়া যায়, তাহাদের গায়ে বড় একটা হাত দিতে চাই না। এমনই করিয়া মনকে সান্ত্বনা দিই—আমরা বুদ্ধিমান, বিচারশীল; কিন্তু যুক্তি যে আমাদের প্রবৃত্তিকে অনুসরণ করে, যুক্তি মানিয়া প্রবৃত্তি যে মোটেই চলে না, তাহা বুঝিয়াই উঠিতে পারি না। তাই, প্রত্যহই দেখি কত লোক সাধু বলিয়া পরিচিত হইয়াও বিনা টিকিটে রেল গাড়ীতে চড়িতেছে, ঘুষ লইতেছে, ব্যবসায় করিতে গিয়া পরকে ঠকাইতেছে। অর্থ-গ্রন্থিই (Money Complex) তাহাদের ঐ সমস্ত অশোভন কর্মে প্রবৃত্ত করিতেছে, কিন্তু জিজ্ঞাসা করিলে হয়ত তাহারা বলিবে "রেল কোম্পানী ত' আর একটা মানুষ নয় যে তাকে ঠকাব! বিনা টিকিটে গেলে কাহারও কোন লোকসান হয় না, মাঝখান থেকে আমার একটা লাভ হ'য়ে গেল, আর শালারা ভাড়া এতই বাড়িয়েছে যে উহাদের না ঠকালেই অধর্ম করা হয়"—এমনই কত শত বিকৃত যুক্তি আসিয়া তখন ঐ অন্যায় কর্মকে সমর্থন করে। আবার এমনও হয়—বাহিরে সাধুর মত ব্যবহার করিতেছি, কিন্তু কোন গুপ্ত অসৎ গ্রন্থি অব্যক্ত মনে থাকিয়া হয়ত আমাদিগকে দিয়া সাধুর মত কাজ করাইয়া লইতেছে। তাই, কাহারও কোন কাজ বাহির হইতে দেখিয়া আমরা অনেক সময়ে মুস্কিলে পড়ি, কি উদ্দেশ্যে কাজ করিতেছে তাহা অনেক সময়ে বুঝিয়া উঠিতে পারি

না। রাজনীতিক্ষেত্রে কখন কখন নেতৃগণ এইরূপ গ্রন্থির বশে ঘোরতর কর্মবীর হইয়া উঠেন, দেশের কত কাজ ভীষণ উৎসাহে আরম্ভ করিয়া জনসাধারণকে চমৎকৃত করিয়া দেন। কিন্তু প্রায়ই আত্মপ্রতিষ্ঠা, প্রতিশোধ বা ঐরূপ কোন গ্রন্থি তাদের ঐ ইচ্ছার মূলে কাজ করে। তাঁহারা গ্রন্থির ফাঁদে এমনই ঘুরপাক খাইতে থাকেন যে তাঁহাদের কিছুতেই বুঝিবার আর সাধ্য থাকে না যে তাঁহাদের কর্ম ঐ রকম কোন গ্রন্থিরই সাময়িক বিকৃত উচ্ছ্বাস মাত্র।

আমরা দেখিলাম, মনে কতগুলি গ্রন্থি গড়িয়া উঠে। আবার পূর্বে দেখিয়াছি—মনের চারিটি স্তর আছে। প্রতিদিনই বাহিরের জগৎ আমাদের মনে কত না ছাপ রাখিয়া যায়। এই ভাবগুলি বিশেষ বিশেষ গ্রন্থিকে অবলম্বন করিয়া মনে দানা বাঁধিয়া উঠিতে থাকে। এমনই করিয়া মনের ভাল মন্দ কত বিচিত্র গ্রন্থি আজন্ম আমাদের কত না কর্মে, চিন্তায়, সুখ-দুঃখের দোলায় দুলাইতেছে। তাই আমরা হাসিতেছি, কাঁদিতেছি, পুতুলবাজীর পুতুলের মত সংসার-ক্ষেত্রে নাচিয়া বেড়াইতেছি।

⁂

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

দ্বন্দ্ব (Conflict)

ধরুন, কোনো বিশেষ গ্রন্থি আপনার মনের সঙ্গে খাপ খাইল না, কেমন বেসুরা লাগিল। গ্রন্থিটি হয়ত আপনাকে এমন কর্মে প্রবৃত্ত করিতে চাহিতেছে যাহাতে আপনার নৈতিক আদর্শ ক্ষুণ্ণ হয়, সুনাম নষ্ট হয়। তখন আপনার ব্যক্তিত্ব ও গ্রন্থি উভয়ের মধ্যে একটা দ্বন্দ্ব উপস্থিত হইবে। এখানে ব্যক্তিত্ব বলিতে গ্রন্থিটি ছাড়া আপন মনের বাকি সবটাকেই বুঝিব। কখনো আবার দুইটি গ্রন্থির মধ্যে এই দ্বন্দ্ব উপস্থিত হয়; আর এই দ্বন্দ্বের ফলে ব্যক্তিত্ব ও গ্রন্থির বিরুদ্ধ টানে পড়িয়া মন ক্ষত-বিক্ষত হইয়া যাইবে, আপনার কর্মে একটা শিথিলতা দেখা দিবে। যখনই আমরা অলস, কর্মবিমুখ অথবা দুর্বল হইয়া পড়ি, তখন আত্মবিশ্লেষণ করিলে দেখা যায়—এক বা একাধিক গ্রন্থি আছে বলিয়াই তাহাদের দ্বন্দ্বে মন ছিন্ন-ভিন্ন হইয়া অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছে।

আসুন আমরা পূর্ববর্ণিত যুবকটির মনের মধ্যে ঢুকিতে চেষ্টা করি। ধরুন, যুবকটি যে যুবতীর প্রতি আসক্ত হইয়াছে তিনি পরস্ত্রী। এখানে তাহার ব্যক্তিত্বের সহিত পরস্ত্রী-গ্রন্থির দ্বন্দ্ব উপস্থিত হইবে। তাহার নৈতিক শিক্ষা-দীক্ষা লইয়া যে ব্যক্তিত্ব গড়িয়া উঠিয়াছে, তাহার সহিত ঐ অপ্রীতিকর পরস্ত্রী-গ্রন্থির দ্বন্দ্বে সে অস্থির হইয়া উঠিবে। এমনই যখন আমাদের মনের কোন গ্রন্থি অপ্রীতিকর বোধ হয়, তখনই উহার সঙ্গে আমাদের ব্যক্তিত্বের একটা ঘাত-প্রতিঘাত চলিতে থাকে। ইহাকেই বলে মনের দ্বন্দ্ব। প্রায়ই আমরা সুমতি কুমতির এই লড়াই করিতেছি, আর একটা শ্রান্ত দুর্বহ মন লইয়া

অনেকেই জীবনটা কাটাইয়া দিতেছি। এমনই দ্বন্দ্বের দোটানায় যুবকটি কিংকর্তব্য-বিমূঢ় হইয়া পড়িবে; অবশেষে অশান্তি উপদ্রবের হাত হইতে সে প্রাণ পণে পরিত্রাণের উপায় খুঁজিয়া বাহির করিবার জন্য ছট্‌ফট্ করিতে থাকিবে।

এইরূপ দ্বন্দ্ব যখনই আমাদের মন বিপর্যস্ত করিয়া তুলে, তখন গ্রন্থিটি ধরিয়া ফেলিয়া আত্মবিচারের দ্বারা এই দ্বন্দ্বের মীমাংসা করিয়া কর্তব্য নিরূপণ করাই ইহার আদর্শ সমাধান। কিন্তু প্রায়ই দ্বন্দ্ব উপস্থিত হইলে আমরা উহার পূর্ণ সমাধান করিতে পারি না। তাহার প্রধান কারণ, আমরা বুঝি না—কোথায় আমাদের গ্রন্থি, কি আমাদের করা প্রয়োজন; অজ্ঞতার জন্য সমস্যাটা আমরা আরও গুরুতর করিয়া তুলি। যুবকটি এ ক্ষেত্রে হয় স্ত্রীলোকটির সহিত লালসা-বিহীন নির্দোষ বন্ধুত্ব স্থাপন করিয়া তাহার নীতিবোধ ও আত্মসম্মান অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারিত, না হয়,পরিণাম চিন্তা করিয়া ঐ দুষ্ট গ্রন্থি ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া পূর্ণ শান্তি লাভ করিতে পারিত। কিন্তু মনের উপর কর্তৃত্ব না থাকিলে উহা সম্ভবপর হয় না; তখন সমস্যাটার মীমাংসা না করিয়া দ্বন্দ্বটাকে এড়াইতে চাই, অশান্তির হাত হইতে সাময়িক ত্রাণ পাইতে গিয়া মনের অসুস্থতা ঘটাই। গ্রন্থিটি ছাড়িতেও পারি না অথচ উহার হাত হইতে বাঁচিতেও চাই; তখন আমরা নিজেদেরই ফাঁকি দিই।

যখন পরস্ত্রী-গ্রন্থি যুবকের মন অধিকার করিয়া বসে তখন সে রমণীর প্রতি কামাসক্ত হয় আর তখন ভুলিয়া থাকিতে চেষ্টা করে যে তাহার সামাজিক দায়িত্ব বা নীতি-বুদ্ধি আছে, সে দায়িত্বপূর্ণ সভ্যসমাজেরই একজন। আবার যখন তাহার ব্যক্তিত্ব বোধ জাগিয়া উঠে, তখন ঐ গ্রন্থিটি স্মৃতি হইতে মুছিয়া ফেলিতে চেষ্টা করে। মনে

তখন দুইটা বুদ্ধিই সমান প্রভাব বিস্তার করিয়া রহিয়া যায় অথচ এমনভাবে থাকে যে উভয়ের সঙ্গে আর দেখা সাক্ষাৎ হয় না। জ্ঞান যখন ফিরিয়া আসে তখন যুবকটি নানা জল্পনা কল্পনা করে—আর কখনই আসক্ত হইব না ভাবিয়া নানা বুদ্ধি আঁটে। কিন্তু ঐ গ্রন্থির টানে পড়িলেই সমস্ত বিচারবুদ্ধি ভাসিয়া যাইতে থাকে। প্রথম হয়ত কিছু বিরুদ্ধ যুক্তি করিল, কিন্তু আস্তে আস্তে গ্রন্থিটি যেই জাগিয়া উঠে, তখন তাহার ব্যক্তিবোধ লুপ্তপ্রায় হয়, প্রবৃত্তিস্রোতে গা ঢালিয়া দেয়, পরস্ত্রীকে উপভোগ করে। তারপর আসে একটা অবসাদ, সে তখন যেন শূন্য হইয়া মিলাইয়া যাইতে চায়। কিন্তু ধীরে ধীরে তাহার ব্যক্তিত্ববোধ, নীতিবোধ জাগিয়া উঠিতে থাকে। তখন তাহার বিচারবুদ্ধি ঐ অন্যায় বুদ্ধিটার সঙ্গে আপোষ করিয়া একটা রফা বন্দোবস্ত করিতে চায়। কিন্তু আগুন আর জল যেমন একত্র থাকিতে পারে না, হয় জল বাষ্পে পরিণত হইবে নয় আগুন নিবিয়া যাইবে। তেমনই বিরুদ্ধধর্মী দুই গ্রন্থির পরস্পর একত্র অবস্থান অসম্ভব। তখন ঐ পরস্ত্রী-গ্রন্থি যে তাহার মনে আছে সেই কথাটাই যুবক অস্বীকার করিতে চাহিবে। এইরূপে ক্রমশঃ তাহার মন দুই খণ্ডে খণ্ডিত হইয়া পড়িবে। তখন সে নিজের মনটাকে ভাঙ্গিয়া দুইটি প্রকোষ্ঠ রচনা করিবে, আর উভয়ের মধ্যে আনাগোনার পথ বন্ধ করিয়া দিবে। অবশেষে তাহার ব্যক্তিত্ব ও গ্রন্থি উভয়ের যোগসূত্রটি ছিন্ন হইয়া যাইবে। মনের দিকে একবার তাকাইলেই দেখি চিন্তার একটা অবিশ্রান্ত ধারা চলিয়াছে—অদৃশ্য, নিঃশব্দ, অবিচ্ছিন্ন, অবিরল। একটু শান্ত হইলেই আমরা মনের এই অবিরাম ধারা উপলব্ধি করিতে পারি।

কিন্তু এ কথা সুস্থমন সম্বন্ধে আংশিকভাবে সত্য হইলেও অনেক গ্রন্থিযুক্ত মনে একটা বিচ্ছেদ দেখা দেয়। (চলন্ত ছায়া-চিত্রের)

বায়োস্কোপের ছবিগুলি যেমন অবিরাম চলিতে চলিতে মাঝে মাঝে কাটিয়া যায়, তেমনই গ্রন্থির দ্বন্দ্বে মন ছিন্ন-ভিন্ন হইয়া গেলে চিন্তার অবিচ্ছেদ্য যোগসূত্রটি ছিঁড়িয়া যায়। বিখ্যাত ঔপন্যাসিক ষ্টিভেন্‌সন্ ডাক্তার জেকিল্ নামে এক অদ্ভুত চরিত্র অঙ্কন করিয়াছেন। ডাক্তার জেকিল্ লব্ধপ্রতিষ্ঠ, পরোপকারী এক চিকিৎসক, কিন্তু তাঁহার কতকগুলি কুপ্রবৃত্তি প্রবল ছিল। তাঁহার বাসনা গোপনে চরিতার্থ করিবার জন্য তিনি বহু পরিশ্রমে দুইটি ঔষধ আবিষ্কার করিয়াছিলেন। একটি ঔষধ খাইবামাত্র তাঁহার আকৃতি বদলিয়া যাইত, ঐ ঔষধের অদ্ভুত ক্রিয়ায় তাঁহার খর্বকায় কদাকার মূর্তি হইত, তখন তিনি মিষ্টার হাইড্ নামে নিজের পরিচয় দিতেন। এমনই করিয়া নিজের রূপ পরিবর্তন করিয়া নির্বিঘ্নে তাঁহার পাপলিপ্সা চরিতার্থ করিতেন, কারণ কেহ আর তখন মিষ্টার হাইড্‌কে ডাক্তার জেকিল্ বলিয়া চিনিতে পারিত না। আবার অন্য ঔষধটি খাওয়া মাত্রই মিষ্টার হাইড্ ডাক্তার জেকিলে রূপান্তরিত হইতেন। মনের দ্বন্দ্বের ফলে আমরা অনেকেই ডাক্তার জেকিলের মত অল্পবিস্তর খণ্ডিত মন লইয়া বাস্তব জগতে বিচরণ করিতেছি। এমনই করিয়া আমরা অনুতাপের যন্ত্রণা হইতে নিজেদের বাঁচাইতে গিয়া মনের স্বাস্থ্য হারাইয়া বসি। আপনি খুব বিচক্ষণ অথচ অন্ধকারে একটু ঘরের বাহির হইতে হইলেই আপনার গা ছম্‌ছম্ করিয়া উঠে, ভূতের ভয়ে জড়সড় হইয়া পড়েন, অথবা সামান্য একটা আরসুলা দেখিলেই অকারণ সঙ্কোচে উৎকট অঙ্গভঙ্গী করিয়া উঠেন; কিংবা আপনি সুবিজ্ঞ, ধীর, স্থির, কিন্তু বাড়িতে ঢুকিয়াই দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রীর ভয়ে সর্বদা সন্ত্রস্ত। এখানে মনে ভূত, আরসুলা বা স্ত্রী গ্রন্থি সৃষ্টি করিয়াছে, আর আপনার মন এমনভাবে খণ্ডিত হইয়াছে যে ভূত, আরসুলা, বা স্ত্রী যখন আপনার

মন জুড়িয়া বসে তখন আপনার বিজ্ঞ আমিটা নিষ্ক্রিয় থাকে। এমনই করিয়া অন্যান্য অংশে খুব বুদ্ধিমান হইলেও আমরা বহু কুসংস্কারগ্রস্ত হইয়া পড়ি।

তখন নির্বোধের মত ব্যবহারে অথবা অন্যায় কর্ম করিয়াও আমরা বুঝিয়া উঠিতে পারি না—কেমন অন্ধের মত হইয়া যাই। এমনই খণ্ডিত মন লইয়া আমরা অনেকেই জীবন যাপন করিতেছি। ফোঁটা-তিলক কাটিয়া নিয়মিত সন্ধ্যা-আহ্নিক করিয়াও পরের সর্বনাশ করিতেছি, বাড়ীতে সিংহের মত বীরত্ব দেখাইয়া অফিসে শৃগাল সাজিতেছি, ব্যবহারিক জীবনে বহু কাপুরুষতার পরিচয় দিয়াও সভামঞ্চে দাঁড়াইয়া বীর দর্পে বক্তৃতা করিতেছি, স্ত্রীর নিকট সাধু বলিয়া পরিচিত হইয়া বেশ্যাসক্ত হইতেছি, স্বামীর নিকট সতীত্ব বজায় রাখিয়া স্বাধ্বীর মত সংসারযাত্রা নির্বাহ করিয়াও পরপুরুষে আসক্ত হইতেছি; মুখে বলিতেছি এক, কাজে করিতেছি বিপরীত। এমনই করিয়া অনেকের মনে দুই বা বহু আমি বাসা বাঁধে। পূর্বোক্ত অবস্থাগুলির মদ্যদিয়া আমরা ধীরে ধীরে কপট, ভণ্ড, অসুস্থ হইয়া পড়ি, মনুষ্যত্বকে খর্ব করি, বাধানির্মুক্ত সহজ জীবন আর যাপন করিতে পারি না।

⁂

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

নিরোধ (Repression)

অপ্রীতিকর গ্রন্থিগুলি ঘাতপ্রতিঘাতে মনকে খণ্ডিত ও দুর্বল করিয়া তুলে। কিন্তু ঐ পর্যন্ত আসিয়াই আমরা ক্ষান্ত থাকি না। কাঁটার মত গ্রন্থিগুলি তখনও মনে বিঁধিতে থাকে। তখন আমরা উহাদের মন হইতে তাড়াইতে চেষ্টা করি, আর তাড়াইতে গিয়া জাগ্রত মন হইতে ঐ গ্রন্থিগুলি মনের তলায় চাপিয়া রাখি। ঐ গ্রন্থি তখন মনের চেতন-স্তর হইতে ধীরে ধীরে অদৃশ্য হয়। কেমন করিয়া মনের প্রাক্‌চেতন স্তর গঠিত হয়, এইবার আমরা বুঝিতে পারিব। প্রথমতঃ মনে প্রবৃত্তিবশে গ্রন্থির সৃষ্টি হয়। উহা অপ্রীতিকর বোধ হইতে থাকিলে মনের দ্বন্দ্ব হইতে বাঁচিতে গিয়া খণ্ডিত হইয়া পড়ে এবং ধীরে ধীরে ঐ বিচ্ছিন্ন গ্রন্থি প্রাক্‌চেতন স্তরে বাসা বাঁধে। যে প্রক্রিয়া-বশে কোন গ্রন্থি জাগ্রত মন হইতে অব্যক্ত মনে চলিয়া যায় তাহাকে নিরোধ বলে। আমরা তখন গ্রন্থিটির অস্তিত্বই ভুলিয়া যাই।

এমনই করিয়া আমরা ভুলিয়া যাই। অনেকে হয়ত মনে করেন, আস্তে আস্তে কোন ছাপ মন-হইতে মুছিয়া যায়। কিন্তু পূর্বেই বলিয়াছি, কোন ছাপই একেবারে ধ্বংস হইবার নয়, নিরোধের দ্বারা উহাদিগকে মনের নিম্ন স্তরে ঠেলিয়া দিই মাত্র; আর তখনই উহা আমরা ভুলিয়া যাই। পূর্বে এক অধ্যায়ে আমরা ভুল-ভ্রান্তি সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছি। এইবার ভাল করিয়া বুঝিতে পারিব, কেমন করিয়া আমরা ভুল করি বা ভুলিয়া যাই। কিন্তু এই নিরোধের ফলে কোন গ্রন্থি যখন মনের তলায় বাসা বাঁধে, তখন আমরা মনে করি বটে যে সমস্যার হাত হইতে বাঁচিলাম, কিন্তু এইরূপে বাঁচিতে গিয়া আরও অশান্তির সৃষ্টি করিয়া বসি। তখন ঐ গ্রন্থিটিকে আমরা ভুলিয়া

যাই বলিয়া উহার উপর আমাদের আর কর্তৃত্ব থাকে না। যখন-তখন গ্রন্থিটি ভূতের মত নানারূপে আমাদের জাগ্রত মনের উপর প্রভাব বিস্তার করিয়া নানা উপদ্রবের সৃষ্টি করিতে থাকে।

একটি উদাহরণ দিলে কথাটা পরিষ্কার হইবে। ধরুন আমি হঠাৎ-রাগী, সামান্য কারণে উত্তেজিত হইয়া পড়ি। এস্থলেও আমি কোন গ্রন্থির নিরোধ করিয়াছি, আর ঐ নিরুদ্ধ গ্রন্থি আমাকে মাঝে-মাঝে কাণ্ডজ্ঞানশূন্য করিয়া তুলে। হয়ত আমি চটিয়া উঠিয়া নানা যুক্তি দিয়া আমার ব্যবহারের সমর্থন করিতে গিয়া যে কারণ নির্দেশ করিতেছি, আসল ব্যাপারটা তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত,—এমন কি, আমার নিজের সেটা জানা দূরের কথা, রাগিবার কারণটা কেহ ধরাইয়া দিলেও দ্বিগুণ চটিয়া আগুনের মত জ্বলিয়া উঠিব। আমরা গ্রন্থির অধ্যায়ে স্ত্রী-গ্রন্থির মধ্য দিয়া ইহা বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছি। আবার ধরুন, একদিন কথায় কথায় একজন নিরীহ ভদ্রলোকের সহিত আমার ঝগড়া বাধিয়া উঠিল, আর রাগের মাথায় তাহাকে এমন এক ঘা বসাইয়া দিলাম যে ঐ আঘাতেই লোকটির মাথা ফাটিয়া গেল, ফিন্‌কি দিয়া রক্ত ছুটিয়া আসিয়া আমার সমস্ত গা ভরিয়া গেল, দেখিতে দেখিতে তাহার হৃৎপিণ্ডের গতিরোধ হইল, নাড়ী ছাড়িয়া গেল, মৃত্যু ঘটিল। ভিড় জমিয়া উঠিল,—আমি এতক্ষণ নিথর নিস্পন্দ হইয়া দাঁড়াইয়াছিলাম, হঠাৎ 'পুলিশ, পুলিশ, পালাও, পালাও' শব্দে ঊর্ধশ্বাসে দৌড়াইলাম। পুলিশকে ফাঁকি দিলাম বটে—কিন্তু আবার যখন আমি আমাতে ফিরিয়া আসিলাম, তখন ঐ মৃত্যুর শোচনীয় দৃশ্য স্মরণ করিবামাত্রই নিষ্ঠুর স্মৃতি আমাকে পীড়া দিতে থাকিল। ঐ নিহত ব্যক্তিকে কেন্দ্র করিয়া সেই দিনকার সমস্ত স্মৃতি লইয়া এক অপ্রীতিকর গ্রন্থি আমার মনে গড়িয়া উঠিল। আমার ব্যক্তিত্বের সঙ্গে ঐ গ্রন্থিটির বিরোধ বাধিল। ধীরে ধীরে উহার যন্ত্রণাদায়ক স্মৃতির হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইতে গিয়া

গ্রন্থিটি মনের তলায় নিরুদ্ধ করিলাম। কিন্তু ইহাতে ব্যাপারটা দাঁড়াইল আরও গুরুতর। হয়ত জাগ্রতস্বপ্নের (Phantasy) মত ঐ পাপদৃশ্য মাঝে-মাঝে রূপ লইয়া আমার সামনে দেখা দিবে। মাঝে-মাঝে বাস্তব জগৎ স্বপ্নের মত কোথায় মিলাইয়া যাইবে, আর সঙ্গে-সঙ্গে আমার চোখের সামনে হয়ত সেই দিনের মৃত্যুর বিভৎস ছবি রূপ লইয়া বিভ্রমের মত দেখা দিবে। গ্রন্থিটি ভুলিয়া থাকিব বটে কিন্তু কখন যে উহা ক্রিয়াশীল হইয়া মনকে অভিভূত করিয়া বসিবে, তাহার উপর আমার আর কোনই কর্তৃত্ব থাকিবে না। ক্রমশঃ হয়ত এমনই করিয়া জাগ্রত-স্বপ্নের মধ্য দিয়া আমার উন্মাদের লক্ষণ দেখা দিতে থাকিবে।

মনের দুর্বলতা ও অসুস্থতার প্রধান কারণ এই নিরোধ। নিরোধ করিয়া মনকে সাময়িক সান্ত্বনা দিই, ভাবি—বাঁচিলাম বুঝি, কিন্তু নিরুদ্ধ গ্রন্থিগুলি মনের তলায় ছদ্মবেশ লইয়া জাগিয়া উঠিয়া আমাদের বিপর্যস্ত করিয়া তুলে, সুস্থ স্বাভাবিক মনকে দুর্বল, বিকৃত ও অসুস্থ করিয়া দেয়। এমনই করিয়া নিজেদের প্রবৃত্তিবশে আমরা প্রত্যেকেই কতকগুলি নিরুদ্ধ বিস্মৃত গ্রন্থি লইয়া চলিয়াছি। আমরা চিত্রগুপ্তের খাতার কথা শুনিয়াছি—এই নিরুদ্ধ গ্রন্থিগুলিই আমাদের মনের চিত্রগুপ্তের খাতা রচনা করিতেছে।

কখন আবার নিরুদ্ধ গ্রন্থিগুলি নানাভাবে প্রকাশিত হয়। হয়ত পূর্বোক্ত ঘটনার পর হইতে আমার মনে এমন অকারণ ভীতির সঞ্চার হইল যে পুলিশের ভয়ে বা গাড়ীর তলায় চাপা পড়িবার ভয়ে আর রাস্তার বাহির হইতে পারি না। এ ক্ষেত্রে ঐ নিরুদ্ধ গ্রন্থি দর্শন-বিভ্রম বা জাগ্রত-স্বপ্নের সৃষ্টি করিল না বটে কিন্তু অকারণ ভীতির ছদ্মবেশ লইয়া প্রকাশ পাইল।

অপ্রীতিকর নিরুদ্ধ গ্রন্থির হাত এড়াইতে গিয়া মানুষ কত অদ্ভুত উপায় অবলম্বন করে—ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়। ঐ গ্রন্থিগুলিই

অপরূপ ছদ্মবেশে আত্মপ্রকাশ করে। কাহারও কর্মে শিথিলতা দেখা দেয়, মন সঙ্কুচিত হইয়া পড়ে, আবার কেহ কেহ গ্রন্থির দৌরাত্ম্য হইতে ত্রাণ পাইতে গিয়া ব্যস্তবাগীশ হইয়া উঠেন। তাঁহারা এক মুহূর্তও বিনা কাজে কাটাইতে পারেন না, পাছে অপ্রীতিকর গ্রন্থিগুলি মাথা উঁচু করিয়া জাগিয়া উঠে। তাঁহারা সর্বদাই ভীত, সঙ্কুচিত, পাছে অশোভন ইচ্ছাগুলি জাগিয়া উঠিয়া অস্বস্তির সৃষ্টি করে। কেহ হয়ত খুব পরিশ্রমী কেরাণী হইয়া উঠিলেন, বাড়িতে রাত্রি দ্বিপ্রহর পর্যন্ত অপিসের কাজ না করিলে তাহাদের আর ঘুম হয় না, রবিবারটা অন্যের পক্ষে ছুটির দিন হইলেও তাহাদের প্রাণ আইঢাই করিয়া উঠে। আত্মীয় বন্ধু বান্ধব হয়ত তাঁহাদের কাজ দেখিয়া ধন্য ধন্য করিতেছেন। কিন্তু ব্যাপারটা যে এমন, তাহা সাধারণতঃ আমরা লক্ষ্যই করি না। এমনই ব্যস্ত হইয়া প্রাণের দায়ে—হয়, আমাদের অনাবশ্যক ডাক টিকিট সংগ্রহ করিতে হইতেছে, নয়, চায়ের দোকানে মজ্‌লিস বসাইয়া বাজে-কথা জীবন-মরণ সমস্যার মত ধরিয়া লইয়া মহা বিতন্ডার সৃষ্টি করিয়া গৌরবান্বিত বোধ করিতেছি, নয়, বাজে নভেল পড়িয়া নায়ক-নায়িকার জীবনের ঘটনার মধ্য দিয়া আমাদেরই বিকৃত ইচ্ছাগুলিকে চরিতার্থ করিতেছি। কেহ আবার রাস্তায় বাহির হইতেছেন অথবা ট্রেনে চলিয়াছেন, মহা ভিড় ঠেলিয়া বসিয়াছেন, তথাপি একখানা বই পড়িতে পড়িতে চলিয়াছেন। কেহ রোজ সব ক'খানি খবরের কাগজ না পড়িয়া সুস্থ থাকিতে পারেন না। কেহ আবার মনের ভূতের হাত এড়াইবার জন্য বড় বড় আন্দোলনে যোগদান করিতেছেন, স্বদেশপ্রেমিক, সমাজসংস্কারক অথবা ধর্মান্ধ হইয়া উঠিতেছেন। নানা দেশের ধর্মানুষ্ঠানের মধ্যে বহু বিকৃত অঙ্গ-ভঙ্গী আসিয়া পড়ে, আর অর্থহীন বলিয়া মনে হইলেও চির-পোষিত সংস্কারবশতঃ সহজ শ্রদ্ধায় বহু মুদ্রাদোষ আমরা মানিয়া

লইতেছি। ভারতে তান্ত্রিক সাধনার অগণিত বিচিত্র অনুষ্ঠানের সহিত আমরা অনেকেই পরিচিত,—সমস্তই নিরুদ্ধ গ্রন্থির বিকৃত প্রকাশ বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। এমনই কত না বিচিত্র রকমে মনের নিরুদ্ধ গ্রন্থি আত্মপ্রকাশ করিতেছে, অথচ আমরা সেগুলিকে মনের অসুস্থতা দূরের কথা—শক্তিরই পরিচয় ভাবিয়া অনেক সময়ে গর্বই অনুভব করিতেছি।

কখন আবার নিরুদ্ধ গ্রন্থিটি অন্যের উপর আরোপ করি। আমার মনে যখন কাম-প্রবৃত্তি প্রবল হইয়া গ্রন্থি সৃষ্টি করিল, তখন উহার নিরোধ করিলাম। এই নিরোধের ফলে দেখা গেল, আমারই স্ত্রীকে আমি দুষ্টচরিত্রা বলিয়া সন্দেহ করিতেছি। প্রায় সময়েই এমনই করিয়া আমরা পরদোষ দর্শন করি। আবার কখন অপ্রীতিকর নিরুদ্ধ গ্রন্থির দৌরাত্ম হইতে রক্ষা পাইতে গিয়া মাতাল অথবা বেশ্যাসক্ত হইয়া আত্মবিস্মৃত থাকিতে চেষ্টা করি। এমনই করিয়া আমাদের নিরুদ্ধ গ্রন্থিগুলি পরনিন্দা, অত্যধিক পরচর্চা, হিংসা, দ্বেষ, অলসতা বা উৎকট কর্ম-প্রবণতা, এমন কি, নিঃস্বার্থ বা ত্যাগের মধ্য দিয়াও অহরহ অল্পবিস্তর আত্মপ্রকাশ করিতেছে ও আমাদের মনের দুর্বলতা ও অসুস্থতার পরিচয় দিতেছে, আর আমরা তাহা বুঝিয়াও বুঝিতেছি না।

কেহ কেহ নিরুদ্ধ গ্রন্থির উপদ্রবে লোকসমাজ ত্যাগ করিয়া নির্জনতার আশ্রয় লন, হয়ত অরণ্যবাসী হইয়া উঠেন, কিংবা নিরুদ্ধ প্রবৃত্তির হাত হইতে রক্ষা পাইতে গিয়া কৃচ্ছ্রসাধন অবলম্বন করিয়া থাকেন। জগতে সাধু সন্ন্যাসী বলিয়া যাঁহারা পরিচিত, তাঁহাদের অনেকেরই অতীত জীবনের খোঁজ করিলে বহু অপ্রীতিকর গ্রন্থির নিরোধের ইতিহাস উদঘাটিত হইবে। আবার, শুধু জাগরণে নয়, স্বপ্নেও গ্রন্থির এই নিষ্ঠুর লীলা চলিতে থাকে। আসুন এইবার আমরা স্বপ্নলোকে প্রবেশ করি।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

স্বপ্ন (Dream)

বাল্যকাল হইতেই আমরা কত না স্বপ্ন দেখিতেছি। স্বপ্ন কেমন বিচিত্র, —কখন কখন সুন্দর দৃশ্য দেখিলে বলিয়া উঠি, স্বপ্নের মত সুন্দর। কোথা হইতে কোন্ লোকের ভাবরাশি আসিয়া আমাদের ঘুমের মধ্যে এমন ভাবে জাগাইয়া রাখে; রূপ রসের এমন বিচিত্র অনুভূতির মোহন জগৎ রচনা করে। আবার কোন কোন স্বপ্ন অত্যন্ত ভীষণ রূপ লইয়াও দেখা দেয়। কত মত, কত তত্ত্ব স্বপ্নকে ব্যাখ্যা করিতে চেষ্টা করিল, কিন্তু এতদিনেও এ প্রহেলিকার রহস্য উদঘাটিত হইল না।

অনেকে স্বপ্নকে অর্থহীন মিথ্যা কল্পনা বলিয়া উড়াইয়া দেয়, কিন্তু এমনও দেখা যায়—কত লোক হঠাৎ একদিন একটা স্বপ্ন দেখিয়া এমন উৎসাহে অনুপ্রাণিত হইল যে তাহাদের জীবন এক নূতন পথ বহিয়া চলিল;—ঐ স্বপ্নের প্রভাবে তাহাদের জীবন নূতন ভাবে নিয়ন্ত্রিত হইল। আবার ভবিষ্যদ্‌বাণীর মত কোন কোন স্বপ্ন বাস্তব ঘটনারই পূর্বাভাস দেয়, শুনিতে পাই।

কেহ স্বপ্নের ব্যাখ্যা করিতে গিয়া বলেন, আমরা যাহা দেখি বা চিন্তা করি, ঘুমের মধ্যে তাহাই জাগিয়া উঠে। কিন্তু হয়ত স্বপ্নে দেখিলাম মহাপ্রলয় হইতেছে, ভীষণ ভূমিকম্পে পৃথিবী থর থর করিয়া কাঁপিয়া উঠিতেছে, চারিদিকে জলোচ্ছ্বাস; অথচ কেন দেখিলাম বুঝিয়া উঠিতে পারি না। প্রায়ই এমন কত অদ্ভুত স্বপ্ন দেখিতেছি, তাহারা জাগ্রত অবস্থার কোন চিন্তা বা ঘটনার সঙ্গে মোটেই খাপ খায় না। কেহ বলেন, ঘুমের সময়ে শরীরের বাহিরে বা ভিতরে যে

চাঞ্চল্য চলিতে থাকে তাহা মস্তিষ্ককে চঞ্চল করিয়া তুলে, আর সঙ্গে সঙ্গে মনের নানা ভাব রূপ লইয়া স্বপ্ন হইয়া ভাসিয়া উঠে। যেমন পেট বা মাথা গরম হইলে আমরা এলোমেলো স্বপ্ন দেখি। আবার ঘুমের সময়ে কেহ চক্ষুর উপরে উজ্জ্বল আলো ফেলিল, চক্ষুর স্নায়ুজাল উত্তেজিত হইল, স্বপ্নে দেখিলাম ভীষণ আগুন লাগিয়াছে, চীৎকার করিয়া জাগিয়া উঠিয়া দেখি—কেহ চক্ষুর উপর তীব্র আলো ধরিয়া আছে।

ফ্রয়েড্ বলিতেছেন, স্বপ্নের আনুযঙ্গিক কত কারণ ত আছেই, কিন্তু মূল কারণ আমাদের মনের গ্রন্থিগুলি। অব্যক্ত মনের গ্রন্থিগুলি স্বপ্নাবস্থায় ক্রিয়াশীল হয়। গ্রন্থি গুলি শান্ত নিষ্ক্রিয় অবস্থায়ই যে থাকে তাহা নয়। উহারা সতত ক্রিয়াশীল হইতে চাহিতেছে, আর আমাদের মন দ্বন্দ্বের হাত এড়াইবার জন্য নিয়তই উহাদিগকে অব্যক্ত-মনে নিরুদ্ধ করিতে চেষ্টা করিতেছে। আমাদের মনের একটা অংশ সর্বদাই প্রহরীর কাজ করিতেছে; তাহার কাজ শুধু অপ্রীতিকর গ্রন্থিগুলিকে মনের তলায় চাপিয়া রাখা। কিন্তু জাগ্রত মন সব সময়েই সমান ভাবে প্রখর দৃষ্টি রাখিতে পারে না; মনের ক্লান্তি, উত্তেজনা বা অবসাদে অথবা স্নায়ু দুর্বল হইয়া পড়িলে পাহারায় যেই একটু ঢিল পড়ে, অমনি গ্রন্থিগুলি উহাদের প্রভাব বিস্তার করে,— জাগ্রত মনে ক্রিয়াশীল হয়। কি জাগ্রতাবস্থায়, কি নিদ্রিতাবস্থায় যখনই এমন হয়, তখনই গ্রন্থিগুলি জাগিয়া উঠে। তবে ঘুমের মধ্যে মনের প্রহরীও (Censor) নিদ্রিত থাকে; তখন নিরুদ্ধ গ্রন্থিগুলি অবাধে ক্রিয়াশীল হয়। উহারা তখন জাগিয়া উঠিয়া স্বপ্ন-জাল রচনা করিয়া আমাদের অন্তর্নিরুদ্ধ গুপ্ত কামনা গুলিকে বিচিত্ররূপে চরিতার্থ করে। কিন্তু স্বপ্নেও সকল সময়ে গ্রন্থিগুলি যে নিজের উলঙ্গ মূর্তিতে

জাগিয়া ওঠে তাহা নয়। দেখিতে পাই প্রায় স্বপ্নই হেঁয়ালীর মত রহস্যময়, অর্থহীন ও অবোধ্য। ফ্রয়েড্ বলেন, স্বপ্নের মধ্যেও কোন অপ্রীতিকর গ্রন্থির ভাবগুলি আমরা সরল সহজভাবে উপভোগ করিতে কুণ্ঠা বোধ করি। আমরা ঘুমাইয়া পড়িলেও মনের ঐ প্রহরী একেবারে ঘুমায় না। আর প্রহরীকে ফাঁকি দিতে গিয়া ভাবগুলি বিকৃতভাবে, এমন কি, কখনও বা বিপরীত রূপ লইয়া স্বপ্নে জাগিয়া উঠে। এমন কি, স্বপ্নে হয়ত কেহ দেখিতেছেন—তাহার স্ত্রীকে “মা মা” বলিয়া ভক্তিসহকারে ডাকিতেছেন। কিন্তু অত্যধিক কামাসক্তি হইতে যে গ্রন্থি গড়িয়া তুলিয়া তিনি মনের তলায় চাপিয়া রাখিয়াছিলেন, সেই কামভাবই প্রহরীকে ফাঁকি দিবার জন্য সাধুত্বের মুখোস পরিয়া স্বপ্নে দেখা দিল। তিনি ঘুমের মধ্যেও ঐ ভাব বিসদৃশ বোধ করেন, তাই উহা বিপরীত রূপ ধরিয়া স্ত্রীর প্রতি নির্দোষ মাতৃভাবের উচ্ছ্বাসরূপে স্বপ্ন-জাল রচনা করিল।

আমরা দেখিলাম, আমাদের ইচ্ছার পরিপূর্ণতা ও সার্থকতা হয় স্বপ্নে। কোন বালক রসগোল্লা খাইতে ভালবাসে, সে নিমন্ত্রণ খাইতে গেল কিন্তু লজ্জা করিয়া চাহিয়া খাইতে পারিল না, ইচ্ছাটাকে চাপিয়া গেল। রাত্রে স্বপ্ন দেখিল—খুব বৃষ্টি হইতেছে, কিন্তু সে অজস্র রসগোল্লা বৃষ্টি, বালকটি পাগলের মত ছুটাছুটি করিয়া আঁচল ভরিয়া রসগোল্লা কুড়াইতেছে। সে তাহার নিরুদ্ধ ইচ্ছাটাই স্বপ্নের মধ্যে কেমন চরিতার্থ করিয়া লইল। কিন্তু বাল্যের স্বপ্ন সরল। বাল্য-জীবন সহজ সরল; তখনও মনে বহু গ্রন্থি দেখা দেয় না,তাই অপূর্ণ ইচ্ছাগুলিও সরলভাবে ঘুমের মধ্যে দেখা দেয়। আর পরিণত বয়সে মনে গ্রন্থির কত জটিলতা, তাই বহু নিরুদ্ধ বাসনার ঘাতপ্রতিঘাতে

স্বপ্নও রহস্যময় হইয়া উঠে,—অতীত জীবনের কত নিরুদ্ধ প্রবৃত্তি কত না অপরূপ ছদ্মবেশ লইয়া দেখা দেয়।

ধরুন, আমার আপনার উপর কোন কারণে রাগ হইল, ভদ্রতার খাতিরে কোন রকমে রাগটা চাপিয়া গেলাম। কিছুদিন কাটিয়া গেল। একদিন হঠাৎ স্বপ্নে দেখিলাম, একটা বাঘ আসিয়া আপনাকে আক্রমণ করিয়াছে, আর আমি নিস্পন্দ হইয়া দাঁড়াইয়া দেখিতেছি। এখানে আমারই নিরুদ্ধ ক্রোধ হয়ত স্বপ্নে হিংস্র জন্তুরূপে আসিয়া আপনাকে আক্রমণ করিল,—আমার ক্রোধ চরিতার্থ করিলাম। এমনই করিয়া বাল্যের সহজ স্বপ্ন পরিণত বয়সে ক্রমশঃ জটিল হইয়া উঠে।

অবশেষে আসল ইচ্ছাটা একটা অদ্ভুত রূপ লইয়া দেখা দেয়। তখন মনের অচেতন স্তরে গিয়া গ্রন্থিগুলি গভীরভাবে বাসা বাঁধে। যৌবনারম্ভে নিরুদ্ধ কামপ্রবৃত্তি প্রায়ই স্বপ্নে সহজ স্ত্রীসম্ভোগের মধ্য দিয়াই চরিতার্থ করি। কিন্তু পরিণত বয়সে কাম-গ্রন্থির নিরোধ করিলাম—ব্রহ্মচর্য অবলম্বন করিলাম। তখন আর সহজ স্বপ্নে উলঙ্গ মূর্তিতে মনের গোপন গ্রন্থি জাগিয়া উঠিবে না; হয়ত দেখিলাম—ভীষণ বান ডাকিয়াছে, পাহাড়ের মত উঁচু হইয়া জলস্রোত ভীম গর্জনে ছুটিয়া আসিতেছে, আর অসংখ্য মানুষ বর্শা হাতে ভাসিয়া আসিতেছে, উন্নত বর্শাফলক সূর্যকিরণে ঝক্ ঝক্ করিতেছে। এখানে শুক্রক্ষরণ ব্যাপারটাই জলপ্লাবনের বিগ্রহ-মূর্তিতে যেন দেখা দিল। জলস্রোতই বীর্যপাত, আর বর্শাগুলি অগণিত শুক্রকীট বা জননেন্দ্রিয়েরই প্রতীক স্বরূপ। হয়ত বা দেখিলাম, অন্ধকারে পিস্তল হাতে কাহাকেও অনুসরণ করিয়া চলিয়াছি, হঠাৎ গুডুম্ করিয়া পিস্তল ছুঁড়িলাম, আর গুলির আঘাতে লোকটি চীৎকার করিয়া

পড়িয়া গেল। এখানেও সমস্ত ব্যাপারটা স্ত্রীসম্ভোগেরই অপরূপ বিগ্রহমূর্তি। গ্রন্থিগুলি যত বেশি দিনের হইবে, তত অব্যক্ত মনের গভীর স্তরে বাসা বাঁধিবে আর এমনই অবোধ্য, বিকৃত স্বপ্নের সৃষ্টি করিবে।

এমনই করিয়া আমাদের অন্তর্নিহিত কামনাগুলি ঘুমের ফাঁকে কত বিচিত্র বেশ পরিয়া দেখা দেয়। স্বপ্নে কত উড়িতেছি, কত সুন্দর দৃশ্য দেখিতেছি, বিচিত্র বিভীষিকা দেখিতেছি, কতই সুখ উপভোগ করিতেছি। আপাতঃ দৃষ্টিতে বিকৃত অর্থহীন মনে হইলেও উহারা অর্থহীন ত নয়ই বরং গভীর অর্থপূর্ণ। আজ ফ্রয়েড্ শুধু স্বপ্নের গূঢ় অর্থই আবিষ্কার করেন নাই, তিনি বলেন মানসিক অসুস্থতা দূর করিবারও প্রধান সহায় স্বপ্ন। অর্থহীন একটা কিছুর উপমা দিতে হইলেই আমরা বলি স্বপ্নের মত মিথ্যা, অর্থহীন। আজ মনস্তত্ত্ববিৎ বলিতেছেন স্বপ্নের মত সত্যবাদী বন্ধু তাহার আর নাই। এমনই করিয়া যিনি সন্ধান জানেন সামান্য ব্যাপারটিও তাঁহার কাছে কতখানি অর্থপূর্ণ হইয়া উঠে।

আমরা দেখিলাম ভুল-ভ্রান্তি, মুদ্রাদোষ, স্বপ্ন প্রভৃতি কত বিচিত্ররূপে আমাদের গোপন ইচ্ছাগুলি আত্মপ্রকাশ করিতেছে। আর স্বপ্ন ও জাগরণ সব অবস্থার গ্রন্থির ঘাত প্রতিঘাতে মনে নানা ভাবের উদয় হইতেছে। কেহ কেহ আবার জাগিয়াই অপরূপ স্বপ্ন দেখিতেছেন, কত যুবক ভালবাসার প্রতিদান না পাইলে জাগিয়াই কত স্বপ্ন দেখে। হয়ত দেখিল ভীষণ যুদ্ধ বাধিয়াছে, একপক্ষ একেবার হটিয়া যাইতেছে, এমন সময়ে সে নিজে ঘোড়ায় চড়িয়া আসিয়া যেন কোন্ মন্ত্রবলে একাই বিজিত সৈন্যদল হারাইয়া দিল আর সবিস্ময়ে দেখিল কোথা হইতে তাহারই প্রিয়া আসিয়া তাহারই গলায় বরমাল্য দিল, চারিদিকে

ধন্য ধন্য পড়িয়া গেল, সমবেত জনমণ্ডলীর চীৎকারে যুবকের তন্দ্রা ভাঙ্গিয়া গেল। এমন কত কি জাগিয়াই স্বপ্নের মত দেখিতে থাকে। এমনই করিয়া প্রবৃত্তিবশে গ্রন্থিজাল রচনা করিয়া বাস্তব জগতের রূঢ় সত্যকে মানিতে না পারিয়া, উহাকে এড়াইতে গিয়া আমরা মাঝে মাঝে কল্পনার বিকৃত জগতের আশ্রয় লই। প্রকৃতিকে ফাঁকি দিতে গিয়া প্রকৃতির নির্মম প্রতিশোধ সহ্য করিতে না পারিয়া মাঝে-মাঝে বিহ্বলের মত অর্তনাদ করিয়া উঠি। আবার কোন কোন মনস্তত্ত্ববিৎ বলিতেছেন স্বপ্ন শুধু অতীত জীবনের কথাই বলে না, ভবিষ্যতেরও ইঙ্গিত স্বপ্নে রহিয়াছে। ফ্রয়েড্ বলেন আমাদের মনের সবখানিই যখন স্বপ্নের জগৎ গড়িয়া তুলিতেছে, তখন স্বপ্নের ভাবগুলি যে আমাদের ভবিষ্যৎ জীবনের আভাস দেয় বা উহাকে নিয়ন্ত্রিত করে তাহাতে আর আশ্চর্য হইবার কি আছে? কারণ আমরা দেখিলাম আমাদের অতীত ও বর্তমান ইচ্ছাগুলির আংশিক চরিতার্থতা হয় স্বপ্নে—আর আমাদের ভবিষ্যৎ জীবনও মনের গ্রন্থিগুলিরই ঘাত প্রতিঘাতে ধীরে ধীরে মূর্ত হইয়া উঠিতেছে। আজ আধুনিক মনোবিজ্ঞানের দৃষ্টিতে দেখিতেছি স্বপ্ন উপেক্ষার জিনিস নয়, স্বপ্ন মনের গোপন কথা খুলিয়া বলে, গুপ্ত কামনা চরিতার্থ করে, আবার কখনও ভবিষ্যতের কথাও বলিয়া দিতে পারে। আর স্বপ্ন একটা কিম্ভূতকিমাকার ব্যাপার নয়, জাগ্রত ও স্বপ্ন জগৎ উভয়ই মনের একই নিয়মের বশে চলিতেছে। এইবার আমরা মনের পথ বহিয়া জীবনের মূল উৎসের খোঁজে বাহির হইব।

⁂

অষ্টম পরিচ্ছেদ

সুরত ধারা (Libido)

মাতৃগর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ হইয়া আমরা মায়ের সহিত একাত্মতাই অনুভব করি, মায়ের স্তন্যধারায় জীবিত থাকি, পৃথক ব্যক্তিত্ববোধ অতি শৈশবে পূর্ণভাবে জাগে না। ফ্রয়েড্ বলেন অতি শৈশবে মাকে আশ্রয় করিয়া প্রত্যেকেরই মনে একটি গ্রন্থির সৃষ্টি হয়। তিনি ইহার নাম দিয়াছেন 'ঈডিপাস্ গ্রন্থি' (Oedipus Complex)। গ্রীসের উপকথায় আছে রাজা ঈডিপাস্ নিয়তির বশে পিতাকে হত্যা করিল এবং মাতাকে বিবাহ করিল। পরিশেষে ক্ষোভে অনুতাপে পাপ হইতে মুক্ত হইবার জন্য রাজা ঈডিপাস্ প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ নিজের চক্ষু দুইটি উপড়াইয়া ফেলিয়া অন্ধ হইল। অতি শৈশবকাল হইতেই এই ঈডিপাস্ গ্রন্থি (Oedipus Complex) মাতার প্রতি গভীর আসক্তি ও পিতার প্রতি বিরক্তি লইয়া প্রথম ধরা দেয়।

প্রত্যেক শিশুই তাহার মাকে পুরাপুরি পাইতে চায়, মায়ের সঙ্গ ছাড়িতে চায় না। মাকে জড়াইয়া ধরিয়া স্তনের বোঁটা চুষিতে শিশু ভালবাসে, রাত্রে মায়ের সঙ্গে না ঘুমাইলে মন কেমন শূন্য শূন্য বোধ হইতে থাকে। অনেক মা গল্প করিতে করিতে হাসিয়া গলিয়া পড়েন—কেমন করিয়া তাহাদের দুষ্টু খোকা কিছুতেই কাছছাড়া হইতে চায় না, কত আদর করে, ছোট ছোট কচি আঙ্গুল দিয়া কেমন পান সাজিয়া দেয়, কখনও দুষ্টামী করিয়া বলে, "মা! আমি তোমায় বিয়ে করব, বাবা ভাল না, বাবাকে তোমার সঙ্গে শুতে দেব না।" শুধু যে শিশু এমন করে তাহা নয়। খোকাকে পাইয়া মাও আর সব ভুলিয়া যায়। স্বামীর প্রতি প্রণয়ের উচ্ছ্বাস কমিয়া যায়। মা খোকার

সর্বাঙ্গে চুম্বন করিতে করিতে আত্মহারা হইয়া উঠে, খোকা যখন ক্ষুন্নিবৃত্তি হইয়া গেলেও চক্‌চক্ করিয়া স্তনের বোঁটা চুষিতে থাকে তখন দুষ্টু ছেলে পাজি ছেলে বলিয়া আদর করিয়া মা কত গালাগালি দেয়, উৎসুক দৃষ্টিতে খোকার দিকে চাহিয়া থাকে, অনেক সময়ে স্বামী ঐ অবস্থায় ঘরে ঢুকিলে কেমন সঙ্কুচিত হইয়া পড়ে। শিশুও বাপের উপস্থিতি পছন্দ করে না, কেমন বিরক্তিকর বোধ করে; মায়ের দুধ খাইতেছে, বাবা সেদিকে একটু চাহিল, অমনি কচি হাত বাড়াইয়া আপত্তি প্রকাশ করে, অন্যদিকে চক্ষু ফিরায়। বাবা মাকে আদর করিলে শিশুর কেমন বোধ হয়। বিরক্তি-বিদ্বেষ-ভয় মিশ্রিত কেমন একটা অস্ফুটভাব শিশুর মনে দেখা দেয়। বাবার আদরও সব সময়ে ভাল লাগে না, বাবা বিদেশে বাহির হইলে শিশু অনেক সময়ে স্বস্তি বোধ করে। অনেকে বলিবেন খোকার আমিত্বের উন্মেষের সঙ্গে সঙ্গে সে বাবাকে ভয় করিতে আরম্ভ করে, আর মায়ের উপর জবরদস্তি ত শিশু করেই। ফ্রয়েড্ তদুত্তরে বলেন তাহাই যদি হইত তবে মায়ের অনাদরেও শিশুর মায়ের প্রতি টান বাড়িয়া উঠে কেন? আবার বাবার আদরেও শিশু বিরক্তি বোধ করিবে কেন? মাঝে মাঝে শিশু বাবাকেও আদর করে কিন্তু বাবার প্রতি এই ভালবাসা অনেক সময়ে একটা কৃত্রিম অভিনয় মাত্র।

আবার মাতার প্রতি আসক্তি লইয়াই শিশু কন্যার জন্ম হয়, ক্রমশঃ তাহার মধ্যে বিপরীত লক্ষণ দেখা দেয়। সে পিতার প্রতি অনুরক্ত হইয়া উঠে আর মাতাকে বিরক্তির চক্ষে দেখে। পিতাও যে কন্যাতে বেশি আসক্ত হয় আর মাতা পুত্রসন্তানে অধিক অনুরক্ত হয় ইহা কাহারও অবিদিত নাই। ফ্রয়েড্ বলেন এমনই ঈডিপাস্ গ্রন্থি অবলম্বন করিয়া প্রতি মানবশিশুর জীবনের আরম্ভ হয়। তিনি আরও

বলেন কাম স্পর্শমূলক। শুধু যে জননেন্দ্রিয়ের পরিণতির সঙ্গেই আমাদের কাম প্রবৃত্তি সহসা জাগিয়া উঠে তাহা নয়। যৌবনোদগমের বহুপূর্ব হইতেই মাকে স্পর্শ করিয়া, তাঁহার স্তনের বোঁটা চুষিয়া শিশু তাহার ক্ষীণ কাম প্রবৃত্তিটাই চরিতার্থ করিতে আরম্ভ করে। তখন শিশুর ঠোঁট দুখানি বিশেষভাবে এই স্পর্শসুখ অনুভব করে আর বাবাকে বাধাস্বরূপ মনে করিয়া সহজ সংস্কারবশে তাঁহার প্রতি একটা অনির্দেশ্য বিদ্বেষভাব পোষণ করে। ইহাই ঈডিপাস্ গ্রন্থি। রাজা ঈডিপাসের জীবনের ঘটনা পড়িয়া আমরা শিহরিয়া উঠিয়াছিলাম, ফ্রয়েড্ বলিতেছেন তদনুরূপই ক্ষীণ আকাঙ্ক্ষা কামনা লইয়া প্রতি মানবই জন্ম গ্রহণ করে।

একটু বড় হইলে শিশুর অহং জাগিয়া উঠে। সে আত্মপ্রতিষ্ঠ হইতে চায়। তখন সে নিজের দেহের প্রতি চাহিয়া দেখে সে কেমন সুন্দর! গ্রীক পুরাণে আছে নার্সিসাস্ নামে একটি সুন্দর বালক জলে নিজের প্রতিবিম্ব দেখিয়া নিজেকেই ভালবাসিল। অহংকে কেন্দ্র করিয়া বালকের মনে যে নূতন গ্রন্থি দেখা দেয় ফ্রয়েড্ তাহার নাম দিয়াছেন নার্সিসাস্ গ্রন্থি (Narcissus Complex)। বাল্যাবস্থায় বক্তিত্ববোধের উন্মেষের সঙ্গে সঙ্গেই ঈডিপাস্ গ্রন্থির সঙ্গে বালকের দ্বন্দ্ব উপস্থিত হয়, মায়ের প্রতি ঐরূপ আসক্তি সে বিসদৃশ বোধ করে, তাই ঈডিপাস্ গ্রন্থিকে নিরুদ্ধ করিয়া মনের তলায় চাপিয়া রাখে। মায়ের প্রতি টান তখন ধীরে ধীরে কমিয়া যায়, আয়নায় নিজের মুখ দেখিয়া সে মুগ্ধ হইয়া যায়, নিজের অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সৌষ্ঠব দেখিয়া নিজেকেই ভালবাসে, নার্সিসাস্ গ্রন্থির সৃষ্টি হয়। এমনই করিয়া ঈডিপাস্ গ্রন্থির নিরোধে অহং বা নার্সিসাস্ গ্রন্থি জাগিয়া উঠে।

আর একটু বড় হইলে বালক অন্য বালকে এবং বালিকা অন্য বালিকায় অনুরক্ত হইতে আরম্ভ করে। শুধু নিজেকে লইয়া তখন বালকের চলে না, কেমন বিসদৃশ বোধ হয়। তখন বালকের আত্মপ্রীতি নিজেকে ছাপাইয়া সমজাতীয় অন্য ব্যক্তির উপর গিয়া পড়ে। তাই আমরা দেখিতে পাই বালক বালকের প্রতি আসক্ত হয় আর বালিকা বালিকার সহিত সখিত্ব স্থাপন করে। এমনই করিয়া নার্সিসাস্ গ্রন্থির আংশিক নিরোধে আবার বালক বালিকার মনে সম-যৌন গ্রন্থির (Homo-sexual Complex) আর্বিভাব হয়।

অবার কৈশোর হইতে যৌবনে পদার্পণ করিলে পুরুষ, নারীর মধ্যে এক নূতন সৌন্দর্য্য দেখিয়া মুগ্ধ হয়, নারীও পুরুষকে দেখিয়া একটা নূতন আকর্ষণ অনুভব করিতে আরম্ভ করে। যৌবনোদগমের সঙ্গে-সঙ্গে কৈশোরাবস্থার ক্ষীণ প্রবৃত্তি দুর্ধর্ষ হইয়া উঠে, দেহেরও পূর্ণ বিকাশ হয়, যুবক তখন পিতামাতার কাছ ছাড়া হইতে চায়, ক্রমশঃ তাহার মনে যৌনপ্রেমের উদয় হয়, আধুনিক মনোবিজ্ঞানের ভাষায় প্রেম-গ্রন্থি (Heterosexual Complex) দেখা দেয়।

আমাদের জীবনে একটির পর একটি করিয়া এই গ্রন্থির ধারা আসে ও চলিয়া যায়। অবস্থার পরিবর্তনের সঙ্গে-সঙ্গে একটি গ্রন্থি যখন আর মনের সঙ্গে খাপ খাইতে চাহে না, অপ্রীতিকর বোধ হইতে থাকে, তখন একটা দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়; অবশেষে নিরোধের দ্বারা গ্রন্থিটি আমরা মনের তলায় চাপিয়া রাখি। ফ্রয়েড্ শত শত রোগীর মনের গভীর স্তর বিশ্লেষণ করিয়া দেখিয়াছেন পূর্বোক্ত চারিটি প্রধান গ্রন্থি প্রত্যেকেরই জীবনে দেখা দেয়, আর এই প্রধান গ্রন্থিগুলির সহিত সমাজের নানা রীতিনীতির ঘাত-প্রতিঘাতে কত শত বিচিত্র গ্রন্থি

আমাদের মনে গড়িয়া উঠে। এমনই করিয়া মূল ঈডিপাস্ গ্রন্থির নিরোধে ধীরে ধীরে বিচিত্র গ্রন্থিপূর্ণ জটিল মনের সৃষ্টি হয়।

ফ্রয়েড্ আরও বলেন, একটা অস্ফুট কামনাধারা আমাদের জীবনের প্রারম্ভ হইতে ব্যক্তিত্বকে গড়িয়া তুলিতেছে। তিনি ইহার নাম দিয়াছেন (Libido), আমরা ইহাকে সুরতধারা বলিতে পারি। আমাদের যত কিছু গ্রন্থি এই সুরত ধারারই রূপান্তর। এই সুরতধারা (Libido) আমাদের জীবনের স্বরূপ। এই ধারা বয়ঃপ্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে ক্রমশঃ আপন ব্যক্তিত্ব হইতে বাহিরের জগতে ব্যাপ্ত ও বহু শাখায় বিভক্ত হইয়া পড়ে। জীবনের মূল ঈডিপাস্ গ্রন্থি সুরত ধারার প্রথম প্রকাশ, বাল্যজীবনে এই ধারাই নার্সিসাস্ গ্রন্থি-রূপে উদ্ভিন্ন হইয়া উঠে এবং কৈশোরে ও যৌবনে কত বিচিত্র গ্রন্থির সৃষ্টি করে। আবার ঈডিপাস্ গ্রন্থির দিকে তাকাইলে দেখি রাগ ও দ্বেষ লইয়াই আমাদের জীবনের আরম্ভ। তাই,জীবনের মূল উৎসের দিকে চাহিয়া দেখি জীবনের আরম্ভ হইতেই দুই বিরুদ্ধ ইচ্ছার টানে পড়িয়া আমরা সংসার-সমুদ্রে হাবুডুবু খাইতেছি।

⁂

নবম পরিচ্ছেদ

জন্মরহস্য

মাতার গর্ভে শিশুর প্রথম জন্ম মুহূর্তটি কেমন? পুরুষ ও নারীর মনের কেমন একটা নিগূঢ় মিলনে শিশু গর্ভস্থ হয়, কোন্ শক্তি কেমন করিয়া শিশুর দেহ, মন, প্রাণ গড়িয়া তুলে; এই অদ্ভুত সৃষ্টিরহস্য জানিবার জন্য কাহার না কৌতূহল জন্মে? তাই প্রসঙ্গতঃ আমরা এই বিষয়টি সংক্ষেপে আলোচনা করিব।

পুরুষ ও নারী প্রেমের টানে পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট হয়। প্রেমে দেহ, মন ও প্রাণ প্রিয়তমের জন্য বিলাইয়া দিবার তীব্র আবেগ জাগিয়া উঠে; তাই প্রেমে দেহ, মন ও প্রাণের কোনটি অপ্রধান নয়, আবার কোনটি একান্তও নয়। স্বামী-স্ত্রী তখন এক দেহ, এক মন ও এক প্রাণ হইতে চায়; ইহাই পুরুষ ও নারীর সঙ্গম। স্বামী-স্ত্রীর প্রেম, দেহের সঙ্গমের সময়ে একটা তীব্র একাগ্রতা আনিয়া দেয়। একাগ্র প্রেমই ইচ্ছাশক্তির মূল প্রস্রবণ। সৃষ্টির ইচ্ছা হইল, পুরুষ ও প্রকৃতির মহামিলনে বিশ্বসৃষ্টি হইল শুনিতে পাই। বীজাকারে যে ইচ্ছা ছিল তাহাই পরিদৃশ্যমান জগৎরূপে বিকশিত হইয়া উঠিল। স্বামী-স্ত্রীর মিলনে উভয়ের দেহমন-ব্যাপী এক তীব্র আন্দোলন চলিতে থাকে। স্বামীর কত ইচ্ছা, গ্রন্থি হইয়া তাহার অব্যক্ত মনে নিষ্ক্রিয় হইয়া রহিয়াছে। একাগ্র অবস্থায় জাগ্রত মনের চাঞ্চল্য চলিয়া যায়। তখন অব্যক্ত মনের গ্রন্থিগুলি ক্রিয়াশীল হয়। আমরা জানি মস্তিষ্ক হইতে স্নায়ুজাল কেমন করিয়া সমগ্র-দেহে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। মনে কোন গ্রন্থি ক্রিয়াশীল হইলে উহা মস্তিষ্কের উপর ক্রিয়া করে এবং স্নায়ুতন্ত্রীর মধ্য দিয়া শরীরের বিভিন্ন স্থানে স্নায়ু-প্রবাহ সৃষ্টি করে। এই স্নায়ু-

প্রবাহ তড়িৎ-প্রবাহেরেই অনুরূপ। স্ত্রীসঙ্গমের সময়ে জননেন্দ্রিয় উত্তেজিত হয়। তখন মনের গ্রন্থি যেই জাগিয়া উঠে অমনি মেরুদন্ডের স্নায়ুগুচ্ছ দিয়া একটা শক্তি প্রবাহ জননেন্দ্রিয়ে নামিয়া আসে আর শুক্রকীটগুলির (Spermatozoa) বীজকেন্দ্রে (Nucleus) একটা গূঢ় পরিবর্তন আনিয়া দেয়। সঞ্চারিত সূক্ষ্ম শক্তিতে শক্তিমান হইয়া অদ্ভুত চাঞ্চল্য লইয়া অগণিত শুক্রকীট লেজ নাড়িতে নাড়িতে স্ত্রীজননেন্দ্রিয়ের মধ্য দিয়া জরায়ুতে প্রবেশ করে। স্ত্রীর মধ্যেও গ্রহণোন্মুখ একটা তীব্র আকাঙ্ক্ষা জাগিয়া উঠে, তাহার দেহ মন প্রিয়তমের সবখানি গ্রহণ করিবার জন্য উত্তাল হইয়া উঠে, তাহারও ডিম্বস্থলী হইতে ডিম্বকোষ জরায়ুমুখে বাহির হইয়া আসে, শুক্র ও ডিম্বের মিলন হয়, দ্রুত লেজ নাড়িতে নাড়িতে শুক্র ডিম্বটিকে ভেদ করিয়া যেই উহার ভিতর প্রবেশ করে—অমনি শুক্র ও ডিম্ব উভয়ে মিলিয়া এক হইয়া যায়। শুক্র ও ডিম্বের সম্মিলনে যে বিন্দুটি উৎপন্ন হয়, তাহাই শিশুর জন্মমুহূর্তের দেহ—সূক্ষ্ম একটি কণা-মাত্র, অণুবীক্ষণের সাহায্যেই উহা দেখা সম্ভব।

পুরুষ সক্রিয়, নারী গ্রহণশীল, পুরুষ আর নারী যেন একই চুম্বকের দুইটি দিক কিংবা একই তড়িত কোষের দুইটি প্রান্ত। তাই, উভয়ের সম্মিলনে চুম্বকেও তড়িত কোষেরই মত শক্তির স্ফূরণ হয়। উভয়ের প্রেম যতই ঘনীভূত হয় ততই সন্তানের সুস্থদেহ ও দৃঢ়চরিত্র হইবার সম্ভাবনা বেশী।

কেমেরা যেমন বহির্জগতের ক্ষুদ্র একটা প্রতিকৃতি তুলিয়া লয়, সঙ্গমের সময়ে পুরুষ ও নারীর প্রতিকৃতি- তেমনই শুক্র ও ডিম্বের উপর গিয়া পড়ে। যেন সমস্ত পুরুষটি তাহারই স্নায়ু মন্ডলীর মধ্য দিয়া নিজের দেহ ও মনের একটা প্রতিচ্ছবি সংহত করিয়া শুক্রের

মধ্যে আঁকিয়া দেয়। আবার নারীর একটা প্রতিচ্ছবি ডিম্বকোষটির উপর পড়ে। শুক্রবীজ ও ডিম্বকোষ দেহাভ্যন্তরে পুরুষ ও নারীর প্রতীক রূপে পরস্পর মিলিত হয়। বাহিরে যেমন পুরুষ ও নারীর মধ্যে একাগ্র কামনার তুমুল আন্দোলন চলিতে থাকে, দেহাভ্যন্তরেও শুক্র ও ডিম্বকোষের মধ্যে তেমনই ঘাত প্রতিঘাত চলে, আর তাহারই ফলে পরস্পরের ব্যক্তিত্ব এক হইয়া মিলিয়া যায়। একটি ক্ষুদ্র কণা হইলেও বিন্দুটির মধ্যে মনের গ্রন্থির যে বিপুল শক্তি সংহত থাকে, তাহাই দেহ ও মন হইয়া গড়িয়া উঠে। যে গ্রন্থি একদিন মনের উপর খুবই প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল, তাহাই সুযোগ পাইয়া ঐ শুভমুহূর্তে ক্ষুদ্র কণাটির মধ্যে সংহত হয়। তারপরে একটি কোষ ভাঙ্গিয়া দুইটি কোষে পরিণত হয়; এমন করিয়াই ক্রমশঃ পূর্ণ পরিণত দেহ ও মনের সৃষ্টি হয়। ফ্রয়েড্ সুরত ধারার (Libido) বর্ণনা করিতে গিয়া বলিয়াছেন—আমাদের জীবনকে একটি আবেগধারা নিয়ন্ত্রিত করিতেছে, এই আবেগ স্রোতই (Libido) সুরত ধারা। আবার পিতামাতার সুরত ধারার মিলনই আমাদের জীবনের মূল প্রস্রবণ। বাহিরের ঘাত প্রতিঘাতে সুরত ধারা নিজের প্রয়োজনের অনুরূপ দেহ, ইন্দ্রিয় ও মন গড়িয়া তুলিয়া নানা ইন্দ্রিয়-দ্বারে নিয়তই বাহিরের জগতে ব্যপ্ত হইয়া পড়িতেছে এবং ক্রমশঃ বাহিরের রূপ, রস, শব্দ, গন্ধ ও স্পর্শের আঘাতে মনের নানা আবেগে রূপান্তরিত হইতেছে। এইরূপে কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ ও মাৎসর্যের সৃষ্টি হইতেছে।

আর এই যে জন্ম হয়, এখানে কেহ হয়ত প্রশ্ন করিবেন "আচ্ছা; আমাদের মনের ইচ্ছাই যদি শরীর ধারণ ক'রে শিশুর মধ্যে মূর্ত হইয়া

উঠে, তবে ত সুবিধারই কথা, একটা সৎ ইচ্ছা কোন রকমে মনে আনিতে পারিলেই ত সুসন্তান জন্মিতে পারে।" কিন্তু মনের যে কোন ভাবই যে আমাদের ইচ্ছানুরূপ জন্ম নেয়, তাহা নয়। কারণ, স্ত্রীসঙ্গমের সময়ে মন আমাদের ইচ্ছাধীন থাকে না, আমরা আত্মহারা হইয়া যাই, তাই যে গ্রন্থিটি এক সময়ে মনের উপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিয়া থাকে, তাহাই স্ত্রীসঙ্গমের সময়ে মনে ক্রিয়াশীল হয়।

এখানে একটা উদাহরণ দিলে কথাটা স্পষ্ট হইবে। যেমন হারাধন একটি কৃষক। সে আজীবন চাষই করিয়া আসিতেছে। একদিন হঠাৎ তাহার সহরে ডাক পড়িল, শমন আসিল,—সদরে তাহাকে এক মোকদ্দমার সাক্ষ্য দিতে হইবে। মোকদ্দমার দিন আসিল, হারাধন প্রথম সহরে চলিল। কোর্টে জনতার মধ্যে সে দিশাহারা হইয়া পড়িল। জজসাহেব আসিলেন, তাঁহার জুতার মচ্‌মচ্ শব্দে হারাধন কাঁপিয়া উঠিল, তাঁহার ঝক্‌ঝকে পোষাক দেখিয়া সে একেবারে অবাক্ হইয়া গেল! হারাধন ভাবিতে লাগিল—আমাদের কত কষ্টে দিন কাটাইতে হয়, আর জজ সাহেবের কি সুখের জীবন। কত কথাই তাহার মন তোলপাড় করিয়া তুলিল। মোকদ্দমার সাক্ষ্য দেওয়া কোন-রকমে শেষ হইল, হারাধন গ্রামে ফিরিল বটে কিন্তু জজসাহেব তাহার মন এতই অধিকার করিয়া বসিল যে সে মাঠে ধান কাটিতে যায়, আর ভাবে, আমাদের ঘরে অমন একজন জন্মিলে আমাদের দুঃখ কষ্ট চিরদিনের মত ঘুচিয়া যাইত, ধান কাটে আর ঐ কথাই ভাবে। এমনই করিয়া তাহার মনে জজসাহেব-গ্রন্থির সৃষ্টি হইল। কিন্তু বামনের চাঁদ ধরার মতই হারাধনের এই দুরাশা; তাই, সে অবশেষে হতাশ মনে পরিশ্রান্ত হইয়া জজসাহেবকে ভুলিয়া গেল।

কিছুদিন যায়, হারাধনের স্ত্রীর এক পুত্রসন্তান জন্মিল। বাল্যকাল হইতেই তাহার বুদ্ধির প্রখরতা সকলকে অবাক্ করিয়া তুলিল। কালক্রমে দেখা গেল বালকটি বিদ্বান্, বুদ্ধিমান হইয়া উঠিল এবং বড় হইয়া বুদ্ধিবলে বহু অর্থ অর্জন করিয়া হারাধনের কুলের দুঃখ ঘুচাইল। এখানে ঐ জজসাহেব-গ্রন্থিই হারাধনের পুত্রের মধ্য দিয়া মূর্ত হইয়া উঠিল। এমন করিয়া অপূর্ণ তীব্র ইচ্ছাই সন্তানের মধ্যে রূপ লইয়া বিকশিত হইয়া উঠে।

⁂

দশম পরিচ্ছেদ

ব্যাধি ও বিকৃতি

শৈশব হইতে যে সহজ ধারায় মন বাড়িয়া উঠে, কোন এক সময়ে মনের সেই স্বাভাবিক গতি রুদ্ধ হইয়া যাইতে পারে। দেখা যায় কাহারও বুদ্ধি ও বিচার-ক্ষমতা ঠিক মতই বাড়িতেছে কিন্তু প্রীতি, অনুরাগ আর তেমন বাড়িয়া উঠিল না। সে যেন জীবনের প্রীতির বাঁধন ভুলিয়া একটা রসহীন শুষ্ক জীবন যাপন করিতে থাকে। জীবনের কোন এক বয়সে অনুরাগের সহজ গতি এমনই অবরুদ্ধ হইলে আজীবন একটা মানসিক অপূর্ণতা থাকিয়া যায়। বহু শিশু বিকলাঙ্গ হইয়া জন্মগ্রহণ করে, হয়ত শরীরের একটা বিশেষ অঙ্গ আজীবন অর্ধ-বিকশিত থাকিয়া যায়। অনেকে আবার এমনই বিকল মন লইয়া জীবনযাপন করে। বাল্যে অহং-এর উন্মেষের সঙ্গে-সঙ্গেই কাহারও মনের সহজ বিকাশ বাধাপ্রাপ্ত হইলে তাহার নার্সিসাস্-গ্রন্থি অস্বাভাবিকরূপে নিরুদ্ধ হয়। সে নৃশংস, নিষ্ঠুর, নরহন্তা, কালাপাহাড় হইয়া উঠে। কৈশোরে মনে কোন বিশেষ আঘাত পাইলে সম-যৌন গ্রন্থির নিরোধ হয়; আর এই নিরোধের ফলে পরবর্তী জীবনে আমরা অপরাধী হইয়া উঠি, দুষ্কর্ম-নিরত হই। আমাদের ব্যবহারের কারণ নির্দেশ করিতে গিয়া দেখি, অতীত বাল্য-জীবনের কোন বিস্মৃত-গ্রন্থিই অনেক সময়ে বর্তমান জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করিতেছে।

আবার মনের সহজ বৃদ্ধি প্রতিহত হইয়া কখনও বিকৃত হইয়া উঠে। আমার এক বন্ধু বাল্যে পিতার সঙ্গে পশ্চিমে থাকিতেন। সেখানে প্রত্যহ মাঠে বেড়াইতে যাইতেন। মাঠে কৃষকদিগের অশ্লীল

হাবভাব ও কথোপকথন তাঁহার তরুণ মনে তীব্র কামভাবের উদ্রেক করিত, তিনি সতত ঐ চিন্তা করিতে লাগিলেন। আবার পাঠ্যাবস্থায় তিনি ঘরে-বাহিরে নানা উৎপীড়ন সহ্য করিতেন। স্কুলে ছাত্রগণ তাঁহার প্রতি নিষ্ঠুর ব্যবহার করিত, গ্রামে আত্মীয়-স্বজনের নিকটেও কোন সহানুভূতি পাইতেন না। এমনই করিয়া তাঁহার জীবনের সহজ গতি বিকৃত হইয়া উঠিল। সহানুভূতিহীন বন্ধু-বান্ধবের নির্ম্মম ব্যবহারে তিনি কেমন সঙ্কুচিত হইয়া গেলেন; নীরস, শুষ্ক জীবনে প্রীতি, অনুরাগ আর ফুটিয়া উঠিল না। তখন বাহিরের জগতের আঘাতে তাঁহার সঙ্কুচিত মন কামচিন্তা হইতে ত্রাণ পাইবার জন্য গণিতের মৌলিক চিন্তার আশ্রয় গ্রহণ করিল। তিনি গণিতের মৌলিক গবেষণা করিলেন বটে কিন্তু নীতি-ভয় ও অন্যান্য নানা কারণে প্রবল কামপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করিবার সুযোগ না পাইয়া নিরোধ করিলেন। ক্রমশঃ তাঁহার কামোন্মত্ততা (Nympho-mania) আসিয়া দেখা দিল। অনুক্ষণ তিনি সর্বাঙ্গব্যাপী অসহ্য যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্‌ করিতেন, মাঝে-মাঝে তাঁহার কল্পনা, মূর্ত হইয়া উলঙ্গ নারী-মূর্তিতে তাঁহার চারিদিকে ভাসিয়া বেড়াইত।

আবার মনে হঠাৎ কোন আঘাত পাইলে ঐ আঘাতের প্রতিক্রিয়ায় মনে অপ্রীতিকর গ্রন্থির সৃষ্টি হয়। এমনই করিয়া আমাদের মনে গ্রন্থি গড়িয়া উঠে। আমাদের সহজ প্রবৃত্তির সহিত সমাজের রীতিনীতির যখন বিরোধ বাধে, তখনই মনের অনেক বিকৃতি দেখা দেয়। কারণ, তখন সমস্যার মীমাংসা অনেকেরই পক্ষে সম্ভব হয় না, তাই, আমরা প্রায়ই নিরোধের আশ্রয় গ্রহণ করি। পাপের সৃষ্টি তখনই হয়, যখন মানুষের সহজ প্রবৃত্তির স্বাভাবিক তীব্রতাকে আমরা বুদ্ধি-করা কোন কৃত্রিম নিয়মের দ্বারা দমন করিতে চেষ্টা করি। তাই, কোন সমাজের

রীতি-নীত দেখিয়াই আমরা বুঝিতে পারি, সে সমাজে মনুষ্যত্ব কতটা বিকশিত হইয়া উঠিয়াছে। আর সেই সমাজই আদর্শস্থানীয় যাহা মানবপ্রকৃতির সহজ প্রবৃত্তিগুলিকে অস্বীকার করিয়া মানুষের অন্তরকে বিকৃত করিয়া তোলে না, বরং উহাদের মানিয়া লইয়া মানবসঙ্ঘকে আদর্শের দিকে লইয়া যায়।

কোন কোন সময়ে এমনও দেখা যায়, কেহ সুস্থ স্বাভাবিক জীবন যাপন করিয়া আসিতেছে, হঠাৎ মনে কোন বিশেষ আঘাত পাইয়া তাহার জীবনের স্রোত ঘুরিয়া গেল,—আবার সে বালকের মত ব্যবহার আরম্ভ করিল। সে আর তখন বর্তমানকে উপভোগ করিতে পারে না,—অতীত জীবনের কোন ঘটনার চিন্তা লইয়াই তাহার মন অনুক্ষণ ব্যাপৃত থাকে। বিগত ইউরোপের যুদ্ধে বোমার শব্দে বহু যোদ্ধার মনের এইরূপ বিকৃতি দেখা দিয়াছিল। আমাদের দেশে অনেক 'বিয়ে-পাগলা বুড়োর' কথা শুনা যায়, তাহারাও হঠাৎ মনে কোন আঘাত পাইয়া পরিণত বয়সে যুবকের মত ব্যবহার আরম্ভ করে।

মনের কত ব্যাধি আমরা প্রায়ই লক্ষ্য করি না, আমাদের চারিদিকে মনের ব্যাধির ছড়াছড়ি; অথচ লম্ফঝম্ফ না দেখিলে আমরা মনের বিকৃতি লক্ষ্যই করিতে পারি না। হিষ্টিরিয়া, শুচিবাই, স্বপ্ন-ভ্রমণ সমস্তই মনের ব্যাধি। চিত্তবিশ্লেষণের প্রথম সূচনাই হইল হিষ্টিরিয়া চিকিৎসার মধ্য দিয়া। হিষ্টিরিয়া রোগে রোগী অতীত জীবনের অনেক অংশ ভুলিয়া যায়। হিষ্টিরিয়ার অঙ্গ-সঞ্চালন দেখিলেই মনে হয়, রোগীর দেহের উপর দুইটি শক্তির ক্রিয়া চলিতেছে,—একটি তাহার মনের নিরুদ্ধ ইচ্ছা, আর অন্যটি যেন ঐ ইচ্ছাকে জোর করিয়া চাপিয়া রাখিতে চাহিতেছে। অনেক সময় বাল্য-জীবনের

অপ্রীতিকর কোন ঘটনা মনে চাপিয়া রাখিলে এই প্রকার বায়ুরোগ দেখা দেয়। এমনই করিয়া মনের প্রত্যেকটি রোগের কারণ নির্দেশ করিতে গিয়া আমরা দেখি উপরি-উক্ত চারিটি শ্রেণীর কোন একটির মধ্যে উহা পড়ে।

আবার, আমরা বলিয়া থাকি, রামবাবু খুব সাবধানী লোক; ঘরে তালা দিয়া বাহির হইবার সময় প্রত্যহ পঁচিশ বার তালাটি টানিয়া দেখেন। হরিবাবু খুব রাশ ভারি,—কেহ তাহাকে কখনও হাসিতে দেখে নাই, মুরলীবাবু ঠাণ্ডা লাগিবার ভয়ে গরমের দিনেও তিন জোড়া করিয়া মোজা পায়ে দেন, শরৎবাবুর স্বাস্থ্যের প্রতি অদ্ভুত দৃষ্টি,—তিনি খাইতে খাইতে তিনবার করিয়া হাত ধুইয়া নাড়ী টিপিয়া দেখেন জ্বর হইয়াছে কিনা। এ সমস্তই কিন্তু কিছু-না-কিছু মানসিক বিকৃতিরই লক্ষণ। এরূপ অসুস্থতা অনেক মহাপুরুষের জীবনেও দেখা যায়। লর্ড কিচেনার বিগত মহাযুদ্ধে ইংরাজ-পক্ষের কর্ণধার ছিলেন; কিন্তু বিড়াল দেখিলেই তাঁহার অকারণ আতঙ্কের উদয় হইত। আবার মহাবীর নেপোলিয়ান, যিনি অসংখ্য কামানের গোলার মধ্যেও অটল, অচল থাকিতেন, সামান্য ডাক্তারের ছুরি দেখিবামাত্রই তিনি অকারণ ভয়ে সঙ্কুচিত হইয়া পড়িতেন। পূর্বেই দেখিয়াছি, নিরুদ্ধ গ্রন্থিগুলি কেমন করিয়া নানা ছদ্মবেশে আত্ম-প্রকাশ করে। অনেক সময়ে নিরুদ্ধ কাম-গ্রন্থি ঘৃণা, লজ্জা বা ভয়ের মধ্য দিয়া আত্ম-প্রকাশ করে। কেহ স্ত্রীজাতিকেই ঘৃণা করেন, কেহ বা স্ত্রীলোক দেখিয়াই লজ্জায় ও ভয়ে জড়সড় হইয়া পড়েন, হয়ত বা মুখ লাল হইয়া উঠে; সমস্তই নিরুদ্ধ কামেরই বিচিত্র প্রকাশ। আবার দেখি, সন্তানের কাছে মা'র কোন লজ্জা নাই। কোন কোন স্ত্রী লোকের নিরুদ্ধ কাম-প্রবৃত্তি অন্য কোন অপরাধের মধ্য দিয়া

প্রকাশিত হয়; হয়, তিনি অন্যের কিছু পাইলেই চুরি করেন, নয় শুচিবাইগ্রস্ত হইয়া পড়েন, না হয় কলহ প্রিয় হইয়া উঠেন।

এমনই করিয়া মনে নানা ব্যাধি আসিয়া দেখা দেয়। কেহ মনে করেন, তার মত সুন্দর, বিদ্বান বা বুদ্ধিমান বুঝি আর দ্বিতীয় কেহ নাই; কেহ ভাবিতেছেন, তিনি স্বয়ং ভগবান; কেহ মনে করিতেছেন সবাই একযোগে তাহাকেই অপমান করিতেছে, এমন কি বন্ধুর প্রত্যেকটি ব্যবহারেও তিনি দোষ দর্শন করিতেছেন। কেহ মনে করিতেছেন, তাহার শরীরটা কাচের তৈরী, অতি সাবধানে চলিতেছেন, একটু আঘাত লাগিলেই পাছে ভাঙ্গিয়া চুরমার হইয়া যায়। কেহ মনে করিতেছেন, নারীমাত্রই তাহাকে প্রেমের চক্ষে দেখিতেছে। কোন নারী আবার ভাবিতেছেন, পুরুষমাত্রই তাহার প্রতি আসক্তি প্রকাশ করিতেছে; কেহ ভাবিতেছে, সকলেই তাহার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিতেছে,—সর্বদাই ভীত, কেহ বুঝি তাহাকে বিষ খাওয়াইল; কেহ ভাবিতেছে সে মরিয়া গিয়াছে; আবার কাহারও দৃঢ় বিশ্বাস—প্রত্যেক নারীই দুষ্টচরিত্রা। অনেকে আবার অন্তরের কামপ্রবৃত্তিকে নীতির দায়ে অস্বাভাবিক উপায়ে নিরুদ্ধ করিয়া চির-কুমার থাকিয়া বিকৃত হইয়া পড়িতেছেন, অথবা জগতের সঙ্গে সহজ ভাবে মিশিতে না পারিয়া নির্জন সাধনায় উৎকট কবি, দার্শনিক কিংবা বৈজ্ঞানিক হইয়া উঠিতেছেন। ফ্রয়েড্ বলিতেছেন, আমরা অজ্ঞতাবশতঃ মনে কত গ্রন্থি সৃষ্টি করিয়া ব্যক্তিগত, সামাজিক ও পারিবারিক জীবনকে দুর্বহ করিয়া তুলিতেছি।

আমরা দেখিলাম, কেমন করিয়া কত বিচিত্ররূপে মনে দুর্বলতা, ব্যাধি ও বিকৃতি আসিয়া দেখা দেয়। কি করিয়া মনের স্বাস্থ্য ফিরাইয়া আনিতে পারি, এইবার আমরা তাহারই আলোচনা করিব।

* * *

একাদশ পরিচ্ছেদ

রোগের প্রতিকার

কেহ অন্ধকারে ভয় পাইলে যদি আলো ধরিয়া দেখান যায়, যাহা দেখিয়া সে ভয় পাইতেছে, তাহা একটা অতি পরিচিত জিনিস, তবে তখনই তাহার ভয় দূরে যায়। তেমনই করিয়া চিত্ত-বিশ্লেষক যখন মনের নিরুদ্ধ গ্রন্থিগুলিকে ক্রিয়াশীল করিয়া তাহাদের পুনরায় অনুভব করাইয়া দেন তখনই মনের বিকৃতি চলিয়া যায়, স্বাস্থ্য ফিরিয়া আসে। সংক্ষেপে ইহাই মনের চিকিৎসা—চিত্তবিশ্লেষণ-পদ্ধতি (Psycho-Analysis)। সিগ্‌মুন্ট্‌ ফ্রয়েড্‌ ভিয়েনা সহরে স্নায়ু-রোগের চিকিৎসা করিতেন। তাঁহার সহযোগী ছিলেন ডাক্তার ব্রয়ের। ব্রয়েরের নিকট একটি হিষ্টিরিয়া-রোগগ্রস্ত মহিলা চিকিৎসার জন্য আসিতেন, কেহই তাঁহার রোগ সারাইতে পারেন নাই। একদিন তিনি মনের অশান্তিতে অস্থির হইয়া আপনা হইতেই ডাক্তার ব্রয়েরের নিকট তাহার মনের গোপন কথা খুলিয়া বলিবার প্রস্তাব করিলেন। ব্রয়ের ধৈর্য্য ধরিয়া রোগীর জীবন-কাহিনী শুনিতে লাগিলেন। তাঁহার সহানুভূতি পাইয়া রোগী দ্বিগুণ উৎসাহে সমস্ত কথা খুলিয়া বলিতেছেন,—দিনের পর দিন চলিয়া যাইতেছে। ব্রয়ের সবিস্ময়ে দেখিলেন, মনের গোপন রুদ্ধ কথা প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই মহিলাটি অনেকটা সুস্থ হইয়া উঠিয়াছেন। এমনই করিয়া ক্রমশঃ তিনি রোগ-নির্মুক্ত হইলেন, মনের স্বাস্থ্য ফিরিয়া পাইলেন। এই আকস্মিক অদ্ভুত ঘটনা হইতেই ফ্রয়েডের চিত্তবিশ্লেষণের প্রথম সূচনা।

বর্তমানে ফ্রয়েড্‌, এড্‌লার, ইউঙ্‌ প্রমুখ চিত্তবিশ্লেষকগণ মনের রোগ দূর করিতেছেন। তাঁহাদের চিকৎসা প্রণালীতে সম্পূর্ণ মিল

নাই। তথাপি মোটামুটি তাঁহারা সকলেই প্রায় এক-ই প্রণালী অনুসরণ করিতেছেন। চিত্ত-বিশ্লেষকের চিকিৎসার প্রধান উপকরণ দুইটি। একটি রোগীর অতীত জীবনের কাহিনী, অন্যটি তাহার স্বপ্ন-বৃত্তান্ত।

প্রথমে আমরা দেখিব, কোন্ প্রণালীর মধ্য দিয়া চিত্তবিশ্লেষক রোগীর মনের গোপন গ্রন্থিগুলিকে কেমন করিয়া খুঁজিয়া বাহির করেন। ইহার জন্য সেকেন্ডের ভগ্নাংশ ধরা যায় এমন একটি ঘড়ির প্রয়োজন। পঞ্চাশটি কথা লইয়া একটি তালিকা প্রস্তুত করিতে হইবে। কথাগুলি এমন ভাবে বাছিয়া লইতে হইবে যাহাদের সহিত রোগীর সাধারণ জীবনের অভিজ্ঞতা ও আসক্তির একটা সহজ সম্বন্ধ থাকে,—যাহাতে ঐ কথাগুলি শুনিলেই রোগীর মনের গ্রন্থিগুলি সহজে ক্রিয়াশীল হয়। এখন, ঐ ঘড়ি আর তালিকাটি লইয়া রোগীর কাছে বসিতে হইবে। রোগীকে ভাল করিয়া বুঝাইয়া দিতে হইবে যে তালিকার কোনও একটি কথা শুনিবামাত্রই রোগীর মনে যে কথাটি উদিত হয়, তাহা তাড়াতাড়ি বলিয়া ফেলিতে হইবে। কথাগুলি তখন রোগীর কাছে পড়িয়া যাইতে হইবে এবং প্রত্যেকটি কথার উত্তরে সে যে কথাটি বলিবে তাহা লিপিবদ্ধ করিতে হইবে, আর সঙ্গে-সঙ্গে রোগী কতক্ষণ পরে উত্তর দিল, তাহাও ঘড়ি দেখিয়া লিখিয়া রাখিতে হইবে। এখন ব্যাপার দাঁড়াইবে এই, কোন কথা শুনিয়া মনের নিরুদ্ধ গ্রন্থিতে সাড়া পড়িলেই রোগী স্বভাবতঃ-ই একটু ইতস্ততঃ করিবে, উত্তর দিতে সময় বেশী লাগিয়া যাইবে। আর কোন অপ্রীতিকর গ্রন্থির ভাব মনে জাগিলেই সে উত্তরটা এড়াইতে চাহিবে এবং প্রায়ই একটা অসম্বদ্ধ বেখাপ্পা কথা বলিয়া ফেলিবে। চিত্ত-বিশ্লেষক এই বিলম্বিত উত্তরগুলি লক্ষ্য করিয়া যাইবেন। সুদক্ষ চিত্ত-বিশ্লেষক রোগীর হাবভাব দেখিয়াই তাহার গ্রন্থিগুলি ধরিতে পারেন,—

পূর্বোক্ত পরীক্ষা আর তাঁহার প্রয়োজন হয় না। চিত্ত-বিশ্লেষক তখন রোগীর গ্রন্থিগুলি বুঝিয়া লইয়া নানা সহজ প্রশ্নের মধ্য দিয়া অন্তরের সহানুভূতি দেখাইয়া ধীরে ধীরে ধৈর্যের সহিত রোগীর সম্মুখে তাহার বিস্মৃত গ্রন্থিগুলি এমন সুকৌশলে উপস্থিত করিবেন যাহাতে সে নিজেই উহাদের ধরিয়া ফেলিতে পারে। রোগী তখন অ-সঙ্কোচে প্রাণের সহজ আবেগে অতীত জীবনের গোপন ইতিহাস খুলিয়া বলিতে থাকিবে। চিত্ত-বিশ্লেষক তাহা একমনে অনুসরণ করিবেন। এমনই করিয়া চিকিৎসকের সাহায্য লইয়া রোগী নিজের মনের মানচিত্র প্রস্তুত করিতে থাকিবে। চিত্ত-বিশ্লেষক রোগীর উপর নিজের বুদ্ধি, বিচার বা তাহার চরিত্র সম্বন্ধে কোন মন্তব্য করিবেন না। তিনি রোগীর মনের গ্রন্থিগুলির মধ্যে একটা নূতন সামঞ্জস্য স্থাপনের জন্য সহানুভূতি দেখাইবেন ও সাহায্য করিবেন মাত্র। এমনই করিয়া তিনি সহজ কথোপকথন ও ব্যবহারের মধ্য দিয়া রোগীর সহিত সৌহৃদ্য স্থাপন করিতে চেষ্টা করিবেন। যে দ্বন্দ্বের ফলে রোগী গ্রন্থিগুলি মনে চাপিয়া রাখিয়াছিল সেই অপ্রীতিকর নিরুদ্ধ অনুভূতিগুলিকেই আবার সে তাহাদের দুঃখবেদনা সমেত জাগাইয়া তুলিবে। অবশেষে চিকিৎসকের সহানুভূতির মধ্য দিয়া ধীরে ধীরে রোগী রোগমুক্ত হইয়া উঠিবে।

অব্যক্ত মনই চিত্ত-বিশ্লেষকের লক্ষ্যের বিষয়। অব্যক্ত মনে যে গ্রন্থিগুলি নিরুদ্ধ রহিয়াছে তাহাদের জাগাইয়া তোলাই তাঁহার প্রধান কার্য্য। আমরা পূর্বেই লিখিয়াছি, গ্রন্থিগুলি যত বেশী দিনের হইবে ততই মনের গভীরতর স্তরে বাসা বাঁধিবে। তাই, স্বপ্ন চিত্ত-বিশ্লেষকের প্রধান সহায়; কারণ, স্বপ্নে নিরুদ্ধ গভীর গ্রন্থিগুলি অবাধে ক্রিয়াশীল হয়। ফ্রয়েড্ বলিয়াছেন, স্বপ্নই অব্যক্ত মনে প্রবেশ করিবার রাজপথ।

পূর্বোক্ত সহজ কথোপকথনের সঙ্গে-সঙ্গে রোগীর দৈনন্দিন স্বপ্নও বিশ্লেষণ করিতে হইবে। স্বপ্নবিশ্লেষণ তাড়াতাড়ির কাজ নয়। চিকিৎসক রোগীর স্বপ্নের প্রত্যেকটি বিষয় সযত্নে লিপিবদ্ধ করিবেন। স্বপ্ন-দৃষ্ট প্রত্যেকটি বস্তু, প্রত্যেকটি ব্যক্তি, প্রত্যেকটি ঘটনা ও অনুভূতি যথাযথ লিখিয়া রাখিতে হইবে। রোগীকে বার বার বিশেষ নিপুণতার সহিত প্রশ্ন করিয়া স্বপ্নের সমস্ত বৃত্তান্তটি জানিয়া লইতে হইবে। তখন প্রত্যেকটি কথা ধরিয়া তাহাকে নানা প্রশ্ন করিয়া উত্তরগুলি যথাস্থানে লিখিয়া রাখিতে হইবে। একবারেই যে সব উত্তর মিলিবে তাহা নহে। স্বপ্নের কোন কথার অর্থ হয়ত কিছুতেই বাহির হইতেছে না, হঠাৎ একদিন রোগী নিজেই তাহা বলিয়া ফেলিবে। এমনই করিয়া চিকিৎসক খুব ধৈর্যের সহিত বহুদিন পরীক্ষার পর তাঁহার উপকরণ সংগ্রহ করিবেন, আর রোগী যাহাতে নিজের গ্রন্থির সহিত পরিচিত হইয়া উহাদের হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন তাহার জন্য তাহাকে যথাসাধ্য সাহায্য করিবেন। অবশ্য, চিত্ত-বিশ্লেষক রোগীর নিরুদ্ধ গ্রন্থি জানিতে পারিলেও তাহাকে তাহা অসময়ে জানাইবেন না,—রোগীর নিজেরই ঐ গ্রন্থি আত্ম-বিচার করিয়া অনুভব করিতে হইবে।

চিত্ত-বিশ্লেষণ সম্মোহন-বিদ্যা (Hypnotism) নয়। সম্মোহনবিদ্যার প্রয়োগে একের ইচ্ছাশক্তি অপরের অভিভূত মনে ক্রিয়াশীল হয়। এই বিদ্যাও বহু মনের রোগ দূর করিতে পারে সত্য, কিন্তু ইহার প্রয়োগে মনের অসুস্থতার সাময়িক নিবৃত্তি ঘটে মাত্র,—রোগ নির্মূল হইতে পারে না, অধিকন্তু, রোগীর মন দুর্বল হইয়া পড়ে। চিকিৎসকের মনের প্রভাবে রোগীর অব্যক্ত মন উদ্‌ঘাটিত হইতে পারে না, মনের আবর্জনা মনের তলায় থাকিয়া যায়, জাগিয়া উঠিবার অবকাশ পায় না। কিন্তু চিত্ত-বিশ্লেষণে রোগীর মনের অবাধ স্বাধীনতা চাই, রোগীর

ভাল হইবার দৃঢ় ইচ্ছা থাকা চাই। তাই, এই প্রণালী কোন যাদুবিদ্যার উপর প্রতিষ্ঠিত নয়, আর রোগীর ইচ্ছাশক্তির উপর নির্ভর করিতে হয় বলিয়া ইহাতে বহুদিন ধরিয়া ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতে হয়। স্বাধীন ইচ্ছা লইয়া বাধা-নির্মুক্ত মন সহজ সরল বিশ্বাসে চিকিৎসকের নিকট গোপন কথা প্রকাশ করে। এমনই করিয়া মনের নিরুদ্ধ গ্রন্থি জাগিয়া উঠে। রোগী অতীত জীবনে যাহা যাহা উপলব্ধি করিয়াছে তাহাদের মধ্যে যে যোগসূত্রটি ছিন্ন হইয়া গিয়াছিল, সে তাহা আবার ফিরিয়া পায়। তাহার মনের অধিকাংশই অবিচ্ছেদ্য ভাবপরম্পরা লইয়া তাহার কাছে জানা হইয়া যায়। এ জানা শুধু বুদ্ধির জানা, বিচারের জানা নয়। অন্তরের রুদ্ধ বেদনা-গুলিকে আবার নূতন করিয়া তাহার সম্পূর্ণ সত্তা দিয়া রোগী অনুভব করে এবং তখনই তাহার মন সুস্থ সবল হইয়া উঠে।

আবার মানসিক ব্যাধি ছাড়া শারীরিক ব্যাধিতেও অনেক সময় এই পদ্ধতির বিশেষ কার্যকারিতা দেখা যায়। আমাদের পুরাতন ব্যাধির মূলে মানসিক অসুস্থতা মিশ্রিত থাকেই। এমন কি, একটু বিচার করিলে বুঝিতে পারি, প্রত্যেক ব্যাধি মন হইতে শরীরে নামিয়া আসে। প্রথম অসুস্থ হয় মন, আর মনের অসুস্থতা মস্তিষ্ক ও স্নায়ুগুচ্ছকে আক্রমণ করিয়া ধীরে ধীরে শরীরের কোন বিশেষ অংশে সঞ্চারিত হয়। অনেক সময় একটু লক্ষ্য করিলেই ধরা পড়ে, মনের গ্রন্থিগুলি স্নায়ুমন্ডলীর মধ্য দিয়া নানারূপে শরীরের নানা যন্ত্র আক্রমণ করিয়া রোগের ক্ষেত্র প্রস্তুত করিয়া দেয়। ক্ষয়রোগ, বাতব্যাধি প্রভৃতি প্রায়ই নিরুদ্ধ গ্রন্থিরই পরিণতি। অনেক সময়ে ব্যাধি লক্ষ্য করিলেও মনের গোপন গ্রন্থি ধরা পড়ে। কারণ, নিরুদ্ধ গ্রন্থি নিয়ত মস্তিষ্কের উপর ক্রিয়া করিয়া শরীর ও মনের ব্যাধি আনিয়া দেয়।

বহুদিনের পুরাতন ব্যাধিতে রোগীর শারীরিক অসুস্থতা অপেক্ষা মানসিক দুশ্চিন্তাই অধিক। জিজ্ঞাসা করিলে হয়ত রোগী স্পষ্ট করিয়া কিছু বলিতে পারে না। এক বা একাধিক গোপন গ্রন্থিই মনের ঐরূপ অবস্থার কারণ; আর ইহাদেরই জন্য পুরাতন রোগীর রোগ সারিয়াও সারে না। তখন চিত্ত-বিশ্লেষণ-প্রণালী অনুসরণ করিলে রোগীকে অচিরে রোগমুক্ত হইতে দেখা যায়।

আমরা দেখিলাম, কেমন করিয়া রোগী সুস্থ হইয়া উঠে। আমাদের গ্রন্থিগুলি মনের যোগসূত্রটি ছিন্ন করে; কোনও উপায়ে ছিন্ন-ভিন্ন মনকে ঐক্য-সূত্রে গ্রথিত করিয়া, মনের ফাঁকগুলি ভরাট করিয়া লইলেই মনের বিকৃতি সরিয়া যায়। আমাদের মনের সঙ্গে পরিচয়ের অভাবেই স্নায়ু ও মনের দুর্বলতা ও অসুস্থতা দেখা দেয়। ফ্রয়েড্ বলেন, না-জানাটাই ব্যাধির মূল কারণ নয়। আমাদের অন্তর্নিহিত অনিচ্ছাই এই অজ্ঞানতার মূলে, আর উহাই আমাদের অজ্ঞ, ব্যাধিগ্রস্ত করিয়া রাখে। নীরোগ হইবার একটা গুপ্ত অনিচ্ছা আছে বলিয়াই আমাদের রোগ সারিতে চায় না। অন্তরের অনিচ্ছাগুলিকে নিয়ন্ত্রিত করা—জয় করাই মনের রোগ সারিবার একমাত্র পন্থা। ফ্রয়েড্ বলিতেছেন, অব্যক্ত মনের গ্রন্থিগুলিকে শুধু বুদ্ধি বিচারের দ্বারা জানাই যদি রোগীর রোগ দূর করিবার একমাত্র প্রয়োজনীয় বস্তু হইত, তবে শুধু বই পড়িয়া বা বক্তৃতা শুনিয়াই রোগী সারিয়া উঠিতে পারিত। ক্ষুধার্তকে শুধু খাবারের ছবি দেখাইলেই যেমন পেট ভরে না, বরং তাহার ক্ষুধা বাড়িয়াই উঠে, তেমনই বক্তৃতা শুনিয়া, বই পড়িয়া বা নিজের গ্রন্থির কথা শুধু জানিয়াই রোগীর রোগ যন্ত্রণা দূর হইতে পারে না। তাই, চাই চিত্ত-বিশ্লেষকের সহিত একটা নিবিড় প্রাণের যোগ।

কিন্তু এখানে স্বভাবতঃই প্রশ্ন উঠে—আচ্ছা, ধরিলাম, চিত্তবিশ্লেষকের সহিত একটা প্রাণের মিলন ঘটিল, কিন্তু তাহাতে আমার প্রবৃত্তিগুলি মিলাইয়া যাইবে কোথায়, কেমন করিয়া? এই যে প্রবৃত্তির দ্বন্দ্বে আমার মন অসুস্থ, বিকৃত হইয়া পড়িয়াছে, সেই প্রবৃত্তিগুলি কোথায় কেমন করিয়া কাহার মধ্যে ভোজবাজির মত অদৃশ্য হইয়া মিলাইয়া যাইবে? নূতন মনোবিজ্ঞান বলিতেছে, চিত্তবিশ্লেষণের মধ্যে রোগীর সমস্ত প্রবৃত্তির অবসান হয়। কেমন করিয়া, তাহা আমরা পর-পরিচ্ছেদে দেখিব।

⁂

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

মানস-যৌন অনুরাগ

(Psycho-Sexual Attachment)

রোগী চিত্ত-বিশ্লেষণের সময়ে অজানিত ভাবে নিজের মনের ভাব প্রকাশে নিজেই বাধা দেয়। তাই, তাহার প্রতিকারের প্রধান অন্তরায় সে নিজেই। সে জানিয়াও জানে না—নিজেরই একটা অনিচ্ছার জন্য মনের গোপন কথা প্রকাশ করিতে খুব ইচ্ছুক হইলেও কিছুতেই যেন বলি-বলি করিয়াও সে বলিতে পারিতেছে না। যুক্তি, বা বুদ্ধির দিক্ দিয়া বিচার করিয়া রোগী চিকিৎসকের সাহায্যের জন্য ব্যগ্র—উৎকণ্ঠিত, কিন্তু এক সময়ে সে যে-ইচ্ছা করিয়া রোগের ফাঁদে পা দিয়াছিল সেই ইচ্ছাটাই তাহার রোগের প্রতিকারের প্রধান অন্তরায় হইয়া দাঁড়ায়। তাহার প্রবৃত্তিগুলি মিলাইয়া গেলে জীবনে উপভোগের কি রহিল—ভাবিয়া সে ভীত হয়। রুগ্নাবস্থায় আত্মীয়-স্বজনের যত্ন, শুশ্রূষা ও সহানুভূতি সে পায়, রোগমুক্ত হইলে সে ঐগুলি হারাইবে মনে করে। সে ভাবে, সারিয়া উঠিলে জীবনের কঠোর সত্যগুলির সামনে তাহাকে মুখামুখি হইয়া দাঁড়াইতে হইবে। তাহার সঙ্কীর্ণ আশা আকাঙ্ক্ষার বহুমুখী টানে সে এমনই অভ্যস্ত হইয়া পড়ে যে আবার সারিয়া উঠিয়া বৃহত্তর জীবনের দায়িত্ব-পূর্ণ কাজে মনোনিবেশ করিতে হইবে, এটা তাহার কাছে কেমন বিসদৃশ বোধ হয়। মনের স্বাস্থ্য সে ভুলিয়া যায়,—আর অসুস্থ নিষ্ক্রিয় অবস্থাটাই তখন তাহার নিকট জীবন্ত সত্য বলিয়া প্রতিভাত হয়।

এই অবশ্যম্ভাবী বাধাকে অপসারিত করিতে হইলে রোগী ও চিত্ত-বিশ্লেষকের পূর্ণ সহিযোগিতা প্রয়োজন। ফ্রয়েড্ বলেন,

"Everything depends on the faith you are able to put in the instructor."—চিত্তবিশ্লেষকে বিশ্বাসস্থাপনের উপরই সমস্ত নির্ভর করিতেছে। আবার চিত্ত-বিশ্লেষণ-পদ্ধতি অনুসরণ করিয়া কিছুদূর অগ্রসর হইলেই একটি অদ্ভুত ব্যাপার ঘটিতে দেখা যায়। যে বিশ্বাস ও সহানুভূতি লইয়া চিত্ত-বিশ্লেষণ আরম্ভ হইয়াছিল, ধীরে ধীরে তাহা গভীর প্রেমে পর্যবসিত হয়। উভয়ের বয়স বা মনের বাহ্য অবস্থার কোনই মিল না থাকিলেও এই পদ্ধতির আলাপ-ব্যবহারের মধ্য দিয়া অগ্রসর হইতে হইতে পুরুষ-নারী-নির্বিশেষে প্রত্যেকেই চিত্ত-বিশ্লেষকের প্রতি অনুরক্ত হইয়া পড়ে।

ফ্রয়েড্ বলিতেছেন, চিত্ত-বিশ্লেষকের প্রতি প্রেমই রোগ-নিরাকরণের প্রধান অবলম্বন। এই অনুরাগ যাহার যত তীব্র, তাহার মনোবিকার তত শীঘ্র অবলীলাক্রমে দূরীভূত হইতে দেখা যায়। ইহাকেই মনস্তত্ত্ববিদ্‌গণ Psycho-Sexual Attachment বলেন,—আমরা ইহাকে মানস-যৌন অনুরাগ বলিব। এই অনুরাগেই চিকিৎসার প্রকৃত আরম্ভ। রোগীর মনের সঙ্কোচ তখন প্রকৃতরূপে দূর হয় বলিয়া চিকিৎসকের সহিত একটা সহজ সম্বন্ধ স্থাপিত হয়। অন্তরের গোপন রাজ্যে হৃদয়নীরে অবগাহন করিতে হইলে পরস্পরের কৃত্রিম সম্বন্ধ ভুলিয়া অন্তরের গূঢ় টানেই সেটা সম্ভবপর। মনের গোপন স্তরের কথা জানিতে হইলে প্রণয়ের রীতি অবলম্বন করিতে হইবে। চিত্তবিশ্লেষকের সহানুভূতি ও সমবেদনায় উচ্ছ্বসিত হইয়া রোগী মনের গভীর গোপন বেদনা অনুতাপের অশ্রুজলে সিক্ত হইয়া যখন ধীরে ধীরে তাহার নিকট প্রকাশ করে তখন হইতেই চিকিৎসকের সহিত প্রাণের মিলন আরম্ভ হয়। রোগী চিকিৎসকের সহানুভূতিতে গলিয়া যায়। এমনই করিয়া চিকিৎসা প্রণয়ের মধুর ব্যাপারে পরিণতি

লাভ করে। অনেক সময় দেখা যায়, এই আকর্ষণের ফলে রোগী রাত্রি দিন চিকিৎসকের ভাবে তন্ময় হইয়া থাকে, তাঁহারই কথা ভাবে, অতীত জীবন নূতন রূপ লইয়া তাঁহার নিকট প্রতিভাত হয়, প্রত্যেকটি ঘটনা চিকিৎসকের চোখে দেখিতে চায়। ফ্রয়েড্ বলেন, রোগীর আত্মীয়-স্বজন এই সময়ে তাহাকে নানা বাধা দেয়। অজ্ঞতাবশতঃ রোগীর সহিত চিত্তবেশ্লষকের বিচ্ছেদ ঘটাইতে চায়। তাহাদের প্রতি আসক্তি কমিয়া গেল ভাবিয়া তাহারা স্বভাবতঃই রোগীর প্রতি বীতরাগ হইয়া পড়েন। কিন্তু ধৈর্য্যের সহিত সমস্ত বাধা ধীরভাবে সহ্য করিয়াই রোগীকে অগ্রসর হইতে হয়। তখন তাহার মন চিত্তবিশ্লেষকের উপর ন্যস্ত থাকে। তাহার মনের বিচিত্র গন্থি তখন জাগিয়া উঠে, আর মনের বহুমুখী প্রবৃত্তির সঙ্গে নূতন প্রেমের লড়াই বাধে। তখন রোগীর বহুমুখী আসক্তির সমস্ত বিরুদ্ধতা জাগিয়া উঠিয়া নানা বিরোধের সৃষ্টি করে। আর চিত্ত-বিশ্লেষকের সহিত একান্ত প্রেমে সংলগ্ন থাকিবার নিরন্তর চেষ্টায়ই রোগী রোগ মুক্ত হইতে থাকে। এমনই করিয়া ধীরে ধীরে তাহার মনের বিকার দূরে যায়, স্নায়ুতে নব প্রাণের সঞ্চার হয়,—সে দেখিতে দেখিতে সুস্থ হইয়া উঠে। ফ্রয়েড্ বলেন, “Transference then becomes the battle-field on which all the contending forces are to meet...all the symptoms of the patient have lost original meaning and have adapted themselves to a new meaning which is determined by its relation to transference.” চিত্ত-বিশ্লেষকের উপর অন্তরের অনুরাগ সংন্যস্ত হইলে রোগীর মন একটা নানাভিমুখী বিরুদ্ধ প্রবৃত্তির যুদ্ধক্ষেত্রে পরিণত হয়। রোগের সমস্ত লক্ষণ তখন পুরাতন অর্থ হারাইয়া নূতন অনুরাগের নূতন ভাবে

রোগীর মনে দেখা দেয়। ফ্রয়েড্ বলিতেছেন, এখানে যুক্তি-বিচারের প্রাধান্য নাই। বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা জীবনের জটিলতাকে শুধু কাটিতেই জানে, কিন্তু জীবনকে রূপান্তরিত করিয়া সার্থক করিয়া তুলিতে পারে না। বিশ্বাস ও প্রেমে প্রতিষ্ঠিত হইতে না পারিলে আমরা মনের পরিবর্তন আনিতে গিয়া ব্যবচ্ছেদই করিয়া বসি। আবার প্রেমের স্বরূপ নির্ণয় করিতে গিয়া ষ্টেকেল বলিতেছেন, "One loves a person only when one has firtst loved his faults and accepted his past, And if we can go so far as to love his past, then we have passed love's greatest test."—আমরা কাহাকেও তখনই ভালবাসি যখন আমরা তাহার দোষগুলিও সুন্দর দেখিয়া ভালবাসি আর তাহার অতীত জীবনের সমস্তটাকেই স্বীকার করিয়া লই। আর যদি এই অতীতকে পর্যন্ত ভালবাসিতে পারি, তখনই আমরা প্রেমের প্রধানতম পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হই। ইহাই প্রকৃত প্রেম, আধুনিক মনোবিজ্ঞানের ভাষায় ইহাই Psycho-Sexual Attachment—মানস-যৌন অনুরাগ, আর রোগীর মানসিক বিকৃতি দূর করিবার ইহাই মূল অবলম্বন। কিন্তু আমরা অনেকে মোহ বা কামকে প্রেম বলিয়া অনেক সময় ভুল করি। কাম আর প্রেম—প্রকৃতির একই মহাশক্তির দুই বিপরীত প্রকাশ। কামে প্রিয়কে আমার কামনার অনুরূপ করিয়া উপভোগ করিতে চাই, প্রেমে আমার সমস্ত সত্তা আত্ম-হারা হইয়া প্রিয়তমের দিকে ছুটিয়া যায়—কাম আমার ইন্দ্রিয়ের মধ্য দিয়া প্রিয়তমকে আত্মসাৎ করিবার ব্যর্থ প্রয়াস—লোহা যদি নিজত্ব বজায় রাখিয়া চুম্বককে লোহায় পরিণত করিতে চায়, এ তেমনতর; আর প্রেম দেহ-মন-প্রাণকে রূপান্তরিত, বিবর্তিত করিয়া আমার সত্তাকে প্রিয়তমময় করিবার চিরন্তন সার্থক প্রয়াস।

কেমন করিয়া এই অনুরাগের মধ্য দিয়া রোগীর মনের পরিবর্তন সাধিত হয়, এইবার তাহাই আমরা বিশেষভাবে আলোচনা করিব। সকলেই চুম্বক দেখিয়াছেন। চুম্বক লোহাকে আকর্ষণ করে। ধরুন, একখণ্ড লোহা একটি চুম্বকের নিকট রাখিলাম। আমরা জানি লোহার প্রত্যেকটি পরমাণু একটি চুম্বক। পরমাণুগুলি স্বভাবতঃ পরস্পরের টানে এলোমেলো হইয়া থাকে,—তাই, প্রতি লৌহখণ্ডে চুম্বক শক্তির স্ফূরণ দেখিতে পাই না। কোন রকমে পরমাণুগুলিকে সুবিন্যস্ত করিতে পারিলেই লোহা চুম্বকে পরিণত হয়। এখন, চুম্বকের প্রতি আকর্ষণে লোহার প্রত্যেকটি পরমাণু চুম্বকের সহিত সংলগ্ন হইবার জন্য উন্মুখ হইয়া উঠে; তখন তাহারা এক নূতন রকমে সন্নিবেশিত হইয়া পরস্পর শৃঙ্খলিত হয়, আর সু-সজ্জিত পরমাণুগুলি চুম্বকের টানে বিধৃত হইয়া থাকে। এমনই করিয়া চুম্বককে কেন্দ্র করিয়া লোহার সমস্ত সত্তাটির একটি গূঢ় পরিবর্তন ঘটে, লোহা চুম্বকে রূপান্তরিত হয়, লৌহখণ্ড তখন চুম্বকেরই মত অন্য লৌহখণ্ডকে আকর্ষণ করিবার ক্ষমতা লাভ করে।

আমাদের মনের ভাবগুলিও লোহার পরমাণুরই মত বহুমুখী প্রবৃত্তির টানে এলো-মেলো হইয়া রহিয়াছে; তাই বিচিত্র গ্রন্থির দ্বন্দ্বে রোগীর মন স্বভাবতঃ অসাড়, আড়ষ্ট হইয়া থাকে। চিত্ত-বিশ্লেষকের প্রতি প্রেমের আকর্ষণে মনের ভাবগুলির মধ্যে একটা আলোড়ন চলিতে থাকে,—মনের জাগ্রত ও অব্যক্ত চারিটি স্তর-ব্যাপী তুমুল আন্দোলনের ফলে রোগীর মনে গ্রন্থিগুলির একটা নূতন সমাবেশ হয়। নিরুদ্ধ গ্রন্থিগুলি জাগিয়া উঠিয়া লোহার পরমাণুগুলিরই মত চিত্ত-বিশ্লেষকের প্রেমে বিধৃত হইয়া রোগীর মনে গ্রথিত হইয়া উঠে।

বহুমুখী প্রবৃত্তি একমুখী হইয়া চিত্ত-বিশ্লেষকের উপর নিবদ্ধ হয়। এই নূতন মনোবিজ্ঞানের পরিভাষায় বলিতে গেলে রোগীর সুরতধারা (Libido) চিত্ত-বিশ্লেষকের উপর কেন্দ্রীভূত হয়, তাঁহাকে কেন্দ্র করিয়া রোগীর জীবনের সমস্ত অনুভূতি, বিচিত্র গ্রন্থির নানা অভিজ্ঞতা ঐক্যে প্রতিষ্ঠিত হয়—রোগীর জীবনে একটা পরিবর্তন আসে; এমনই করিয়া সে ধীরে ধীরে সুস্থ হইয়া উঠে।

আর একটি কথা। রোগী তাহার নিজের মনের উপর কর্তৃত্ব হারাইয়া ফেলে, তাই, সে জানে না কোথায় তাহার বিকৃতি। তাই রোগী অন্যের সাহায্য না পাইলে সারিয়া উঠিতে পারে না, আর রোগের দিকে বিশেষ লক্ষ্য না রাখিয়া চিত্ত-বিশ্লেষকের প্রতি অনুরাগে বিভোর হইয়া থাকিতে পারিলে রোগী অবলীলাক্রমে দ্রুত রোগমুক্ত হইতে পারেন।

আবার অহংকে কেন্দ্র করিয়া কাহারও মানসিক অসুস্থতা দেখা দেয়। আমরা দেখিয়াছি, কেহ ভাবে তাহার মত বিদ্বান্ বুদ্ধিমান্ বা সুশ্রী জগতে আর নাই। এই রোগের সাধারণ নাম Narcissism বা অহং-বিকার। এরূপ রোগীর স্বভাবতঃই চিত্ত-বিশ্লেষকের প্রতি একটা বিতৃষ্ণা বা বিদ্বেষ থাকে। কাহারও শরণাপন্ন হইতে হইবে ভাবিলেই তাহাদের মন বিদ্রোহী হইয়া উঠে। এইরূপ অহং-বিকার-গ্রস্ত ব্যক্তি জগতে কাহারও সাহায্য লইবার প্রয়োজনীয়তাই উপলব্ধি করে না, তাহারা নিজেদের এত বড় দেখেন, যে প্রেম বা আত্ম-সমর্পণ তাহাদের নিকট অর্থহীন প্রলাপ ও মনুষ্যত্বের অবমাননাজনক বলিয়া মনে হয়। আমরা অনেকেই অল্পবিস্তর এই অহং-বিকার-গ্রস্ত, তাই ভালবাসিয়া আত্মসমর্পণ করার মধ্যেও একটা লজ্জা ও দুর্বলতা

অনুভব করি। তখন আমরা নিজেই নিজের উন্নতি করিতে গিয়া প্রবৃত্তির জালে পড়িয়া প্রায়ই অধিকতর অসুস্থ হইয়া পড়ি। মনোবিজ্ঞান বলিতেছে, অহং বিকারে চিত্ত-বিশ্লেষক কিছুতেই তাঁহার শক্তি প্রয়োগ করিতে পারেন না বলিয়া চিত্ত-বিশ্লেষণ-পদ্ধতি মোটেই কার্যকরী হয় না।

কিন্তু রোগীর অহংকে কোনরূপে প্রশ্রয় দিতে পারিলে রোগী ধীরে ধীরে চিত্ত-বিশ্লেষকের প্রতি আকৃষ্ট হইতে পারে। আসক্তির সঙ্গে সঙ্গে রোগীর মনে নানা বিদ্বেষ ভাবও জাগিয়া উঠে, কারণ তাহার অহঙ্কারটা খুব-ই সজাগ থাকে। কিন্তু অহং এর পুষ্টির আনন্দে সে তখন এতই বিভোর যে বিরুদ্ধ ভাবগুলিকে সে তখনকার মত মনে চাপিয়া রাখে। কিন্তু হঠাৎ এক সময়ে কোন বিরুদ্ধ ভাবের আঘাতে তাহার বিদ্বেষটা মাথা উঁচু করিয়া দাঁড়ায়, এত দিনের নিরুদ্ধ বিদ্বেষ ভাবগুলি তখন তাহার সমস্ত মন জুড়িয়া বসে, এমনই করিয়া ক্রমশঃ সে চিত্ত-বিশ্লেষক হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে। সে তখন বিদ্বেষবশে তাঁহার অপবাদ ও নিন্দা আরম্ভ করে। কিন্তু চিত্ত-বিশ্লেষক ধীর, স্থির, প্রেমময় থাকিয়া, রোগী বিকারবশতঃ কেন নিন্দাবাদ করিতেছে তাহা হৃদয়ঙ্গম করিয়া তাহার ব্যবহার ক্ষমার চক্ষেই দেখিবেন। কিছু দিনের মধ্যে রোগী বুঝিবে, অন্য কেহই তাহার অহঙ্কারের তেমন প্রশ্রয় দিতে পারে না—তাহাকে ক্ষমা করে না। তাহার মন তখন বিদ্বেষময়, অথচ কেহই তাহাকে ভালবাসে না; কারণ, উগ্র অহঙ্কারীর অহঙ্কারের আঘাতে সকলেই তাহার বিরুদ্ধবাদী হইয়া পড়ে। তখন তাহার মনে একটা হাহাকার জাগিয়া উঠে, মনের নানা দ্বন্দ্বে তাহার অহঙ্কার ভাঙ্গিয়া যায়। এমনই করিয়া সে অনুতপ্ত

হইয়া আবার চিত্ত-বিশ্লেষকের নিকট ফিরিয়া আসে, পূর্বের সুখ-স্মৃতি আবার জাগিয়া উঠে, ধীরে ধীরে তাহার অহংবিকার দূরে যায়, সে মনের স্বাস্থ্য ফিরিয়া পায়। এইরূপ চিকিৎসায় অসীম ধৈর্য্যের প্রয়োজন। চিত্ত-বিশ্লেষক ক্রমাগত রোগীর গুণেরই আলোচনা করিবেন,—তাহার আত্মসম্মান ও অহং-বোধ যাহাতে ক্ষুণ্ণ না হয় দূরে থাকিয়াও তিনি এমনই প্রেমের ব্যবহার করিবেন। এ বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা এই ক্ষুদ্র পুস্তকে সম্ভব নয়।

এতক্ষণ আমরা রোগী লইয়াই ব্যস্ত রহিয়াছি। এইবার আমরা দেখিব কোন্ আশার বাণী লইয়া আধুনিক মনোবিজ্ঞান প্রতি মানবেরই মনের রুদ্ধ দ্বারে করাঘাত করিতেছে।

⁂

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

মানবের আশা

চিত্তবিশ্লেষণ মানুষের কল্পিত মাহাত্ম্যের গর্বকে আজ চূর্ণ করিতে চলিয়াছে। ফ্রয়েড্ বলিতেছেন, "The healthy man is virtually a neurotic"। সুস্থ বলিয়া যাহারা পরিগণিত, তাহাদেরও স্নায়ুবিকার রহিয়াছে। আবার ষ্টেকেল বলিতেছেন, "Weakness of will is the special complaint of the present day"। বর্তমান যুগে ইচ্ছাশক্তির বিশেষ অভাব দেখা দিয়াছে। মনের বিকৃতি ঘটিলেই ইচ্ছাশক্তি কমিয়া যায়, মন দুর্বল হইয়া পড়ে। গ্রন্থির দ্বন্দ্বে ও নিরোধে আমাদের মন খণ্ডিত হইয়া পড়িতেছে। জাতি, পরিবার ও সমাজের আবেষ্টনের মধ্যে বাস করিতে হইলে কত গ্রন্থি মনে গড়িয়া উঠিবে এবং বিরোধের সৃষ্টি করিবেই করিবে। পারিপার্শ্বিক অবস্থা যুগ যুগ ধরিয়া যে অসম্পূর্ণ আচার নিয়ম গড়িয়া তুলিয়াছে, তাহাদের সংঘর্ষে মানুষ দিশাহারা হইয়া পড়ে। আবার যখন দেখি, রাগ-দ্বেষেরই দ্বন্দ্ব রহিয়াছে মূলে, তখন বুঝি মানসিক অস্বাস্থ্য আমাদের জন্মগত অধিকার। জন্মিলে যেমন শারীরিক অসুস্থতা আমাদের ভোগ করিতে হয়, সমস্ত জীবনটা কেহ পূর্ণ স্বাস্থ্য লইয়া কাটাইয়া দিতে পারে না, অন্ততঃ মৃত্যুর সময়ে শরীরটা অসুস্থ হইয়া পড়িবেই, তেমনই প্রত্যেকের জীবনে মনের রোগও আসিয়া দেখা দিবেই। তবে দাঁড়াইল এই, মানুষের সমাজ পাগলের মেলা। আবার, সবাই অসুস্থ বলিয়া আমরা বুঝিতে পারি না আমরা অসুস্থ। যাহাদের অধিকতর বিকারগ্রস্ত বলিয়া বুঝিতেছি তাহাদের আমাদেরই মত চলন-সই করিবার জন্য আমাদেরই একজন চিকিৎসক হইতেছি। এই বিজ্ঞান

বলিতেছে, অপেক্ষাকৃত সুস্থ বলিয়া যিনি পরিগণিত, যিনি আত্মবিচারের দ্বারা নিজের ব্যক্তিত্বকে অনুভব করিতে পারেন, তিনিই চিত্ত-বিশ্লেষক হইয়া রোগীর জীবন নিয়ন্ত্রিত করিবেন। কিন্তু আমরা যাহারা সুস্থ বলিয়া মনে করিতেছি, অথচ সম্পূর্ণ সুস্থ নই, যাহাদের জীবন সংগ্রামে প্রতি মুহূর্তেই সুখ-দুঃখের আবর্তে পড়িয়া আরও অসুস্থ হইবার সম্ভাবনা, তাহাদের কি হইবে? আমরাও কি পূর্ণতার আদর্শ মনে লইয়া জীবন যাপন করিবার জন্য হাহাকার করিতেছি না? জীবনের দুঃখ-বেদনার কশাঘাতে আমরা ত প্রত্যেকেই দিশাহারা হইয়া পড়ি। এমন কয়জন আছেন যাঁহারা বুকে হাত দিয়া বলিতে পারেন "আমার জীবন সুখের জীবন, আর সুখ আমি চাহিনা, দুঃখ আমার কর্মে কখনই শিথিলতা আনিয়া দেয় নাই, দিতে পারে না? জীবনে আমার কোন সমস্যা নাই, কোন ব্যথা নাই?" এমন বিপুল প্রাণ লইয়া কয়জন জন্মগ্রহণ করেন—যাঁহাদের কোন দ্বিধা নাই, যাঁহারা নিরলস অকুণ্ঠিত কর্মে পরিবার, সমাজ ও বিশ্বের জন্য নিজেদের আমরণ বিলাইয়া দিতে পারেন? কই, আমরা ত তাহা পারি না! জীবনের স্রোত বহিয়া চলিতে চলিতে কোথাও আর থই পাই না, জীবনের গতি রুদ্ধ হইয়া যায়; অবার যৌবন পার হইয়া প্রৌঢ়ত্বে পদার্পণ করিলে কর্মে, চিন্তায় শিথিলতা দেখা দেয়, দেহ মন অবসন্ন হইয়া পড়ে, অবশেষে জীবন-সায়াহ্নে মৃত্যুর কালিমা মাখা ছায়ার দীর্ঘ বিভীষিকায় আকুল হইয়া তীব্র আর্তনাদ করিয়া উঠি।

কেহ আছ? কে আছ? কোথায় আছ? কোথায় তুমি? এইগুলি মানব মনের চিরন্তন প্রশ্ন। মানুষ অতীতের দুর্বহ ভারে কাতর, তাই, সে বর্তমান লইয়া খুসী হইতে পারে না। তাহার মনে অহরহ গ্রন্থির

দ্বন্দ্ব চলিতেছে; তাই জানিয়া হউক, না জানিয়া হউক অহর্নিশি সে চায় একটা সমাধান—"হেথা নয়, হেথা নয়, অন্য কোন খানে।" মানুষ বুকভরা বেদনা লইয়া ভবিষ্যতের দিকে চাহিয়া থাকে, কিন্তু কেমন করিয়া তাহার ভবিষ্যৎকে গড়িবে, এখনও মানুষ তাহার খোঁজ পাইল না; তাই, শিব গড়িতে গিয়া প্রায়ই বানর গড়িয়া বসে। আজ চিত্ত-বিশ্লেষণ এই প্রশ্নের একটা সহজ বৈজ্ঞানিক মীমাংসায় লইয়া যাইতে চাহিতেছে। তাই, এই নূতন বিজ্ঞান হাহাকারময় মানবের পরম বন্ধু। এই বিজ্ঞান এক সনাতন পন্থা খুঁজিয়া বাহির করিয়া মানুষকে অমৃতের সন্ধান বলিয়া দিতেছে। আমরা জ্ঞানের উন্মেষের সঙ্গে সঙ্গেই দেখি, আমি আছি, আর আমার বাহিরেও আমাছাড়া কিছু আছে। আ-শৈশব বাহির আর ভিতরের আদান-প্রদান চলিতেছে। বাহিরের জগৎ অন্তরকে আকৃষ্ট করে। অন্তর যখন বাহিরের কোন বস্তুতে সংলগ্ন হয়, ঐ বস্তুটির চিন্তা নিয়া লাগিয়া থাকে, তখন ঐ বস্তুর সংস্পর্শে ধীরে ধীরে আমাদের অন্তরের প্রসার বাড়িয়া যায়। জড় প্রকৃতিকে যাঁহারা ভালবাসিয়া উহার চিন্তায় অনুক্ষণ নিমগ্ন রহিয়াছেন, তাঁহারাই প্রকৃতির রহস্য জানিয়া মানুষের জ্ঞানের প্রসার বাড়াইয়াছেন। জীব-জগতে যখনই মনোযোগ দিয়াছি, তখনই আমরা জীবতত্ত্ববিৎ হইয়াছি। এমনই করিয়া যাহাতে আমরা একাগ্রচিত্ত হই, তাহাই আমরা অন্তর দিয়া উপলব্ধি করিতে পারি। বাহিরের কোন বস্তুতে একাগ্র-চিত্ত হইলেই আমরা তাহাতে সমাহিত হই, তখনই আমরা সে বস্তুর জ্ঞানলাভ করি। এমনই করিয়া ধীরে ধীরে মানুষের অন্তরের সম্পদ বাড়িয়া উঠিল। মানুষ বুঝিল, জলস্থল কি অপূর্ব, আকাশ কি গভীর, কেমন প্রশান্ত, বাতাস কেমন জীবন দান করে, জীবজন্তু কত বিচিত্র, কেমন সুন্দর! কিন্তু ক্রমশঃ মানুষ

অনুভব করিতে লাগিল, জগতের পরম বিস্ময়—সৃষ্টির চরম প্রকাশ সে নিজেই। জীব-জগতের মহা বিবর্তনে মানুষই জড় ও জীবজগতের সমস্ত ঐশ্বর্যকে অতিক্রম করিয়া দেহমন লইয়া কি অপূর্ব মোহনরূপে বিকশিত হইয়া উঠিয়াছে। জীববিজ্ঞান প্রমাণ করিল—মানুষ সৃষ্টির মন্থন-ধন। মনোবিজ্ঞান দেখাইল, মানুষ বহির্জগতের অসীমত্বকে তাহার মনের মধ্যে কি অপূর্ব কৌশলে সংহত করিতে পারে। শরীর বিজ্ঞান দেখাইল, মানুষের স্নায়ু-মন্ডলীর কি অপূর্ব গঠন, দেহের কি অদ্ভুত কারুকৌশল! বিশ্বের জ্ঞান-বিজ্ঞান আজ মানুষের স্বরূপ জানিবার জন্য কেন্দ্রীভূত। বিশ্ব-রহস্য যেন আজ পিন্ডীকৃত হইয়া মানুষের রূপ লইয়া বিকশিত হইয়া উঠিয়াছে। জগতের প্রত্যেকটি বস্তু এতদিন আমরা খন্ড খন্ড করিয়া জানিয়া শুধু বৈজ্ঞানিক হইয়াছি। বিশ্বকে খন্ডিত করিয়া ঐ খন্ডগুলির একটা সামঞ্জস্য খুঁজিয়া পাইতেছি না। আজ আমরা দেখিতে পাইতেছি, মানুষকে জানিতে পারিলেই বিশ্ব-সত্তা বিকশিত শতদলের মত আমাদের অন্তরে উদ্ভিন্ন হইয়া উঠিবে। কারণ, জগতের সঙ্গে মানুষের গূঢ় সম্বন্ধ আজ আবিষ্কৃত হইতেছে; জড়, জীব ও মনুষ্যের মধ্যে যে ঘোর ব্যবধান ছিল তাহা অপসারিত হইতে চলিয়াছে। কিন্তু মানুষ, মানুষকে সৃষ্টির চরম প্রকাশ বলিয়া ধরিয়া লইলেও আবার মানুষে মানুষে প্রভেদ আছে। যে নিয়মে জীব-জগতে বির্তন চলিয়াছে, সেই নিয়মেই যুগ যুগ ধরিয়া মানুষের মধ্যেও উহা চলিয়া আসিয়াছে। আর এমনই করিয়া ক্রমবিবর্তনে মানবজাতির মধ্যে আদর্শ-ব্যক্তিত্ব গড়িয়া উঠিয়াছে ও উঠিতেছে। তাই, সকলেরই প্রতি আমরা আকৃষ্ট হই না। যে হৃদয়ে প্রেম গভীর, যাঁহার সহানুভূতি অসীম, যিনি ধৈর্য্যে অচল, যাঁহার পবিত্র জীবন সামাজিক সর্ববিধ কুসংস্কারের অতীত, যিনি ব্যক্ত ও

অব্যক্ত মনের গূঢ় সম্বন্ধ আত্ম-বিচারের দ্বারা উপলব্ধি করিয়াছেন, যিনি নিজের ব্যক্তিত্বের তলদেশ পর্যন্ত দেখিয়াছেন, তিনিই মানব-সাধারণের আদর্শ,—মানবের মন স্বতঃই তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধায় অবনত হইয়া পড়ে। হ্যাম্‌ব্লিন্ স্মিথ্ বলিতেছেন—উল্লিখিত গুণসমূহ অল্পবিস্তর না থাকিলে উৎকৃষ্ট চিত্ত-বিশ্লেষক হওয়া সম্ভবপর নয়। তাই আমরা দেখিতেছি, মানুষ চিত্ত-বিশ্লেষকের প্রতি স্বভাবতঃই আকৃষ্ট হয়। বাণার্ড হার্টের ভাষায় বলিব—চিত্ত-বিশ্লেষকের মনের homo-geneity আসিয়াছে, অর্থাৎ তাঁহার মন অখন্ড ঐক্যে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। যিনি মনের তলদেশে অবগাহন করিয়া এই অখন্ড ঐক্য যতদূর উপলব্ধি করিয়াছেন, তিনি মানুষের তত বড় আদর্শ। মানব-সাধারণের নিকট তাঁহারাই অখন্ড অসীম; কারণ তাঁহাদের ধারণা করিতে মানুষ নিজত্ব হারাইয়া ফেলে।

মানুষ ইহাদের সহিত প্রেমের সম্বন্ধ স্থাপন করিলে তাহার মনে গ্রন্থির দ্বন্দ্ব থাকে না,—মনের প্রসার বাড়িয়া যায়। তাই, এ বিজ্ঞান শুধু বিকারগ্রস্তকেই স্বাস্থ্য ফিরাইয়া দেয় না, সুস্থ মানবসাধারণের প্রতিভার বিকাশের পন্থার দিকেও অঙ্গুলি-নির্দেশ করে। আমাদের মনের গ্রন্থিগুলিকে—প্রবৃত্তির বিক্ষোভকে যদি অখন্ড ঐক্যের মধ্যে সার্থক করিয়া তুলিতে চাই, তবে আধুনিক মনোবিজ্ঞান অনুসরণ করিয়া বলিতে পারি, তুমি নিজের অহঙ্কারের উপর শুধু নির্ভর করিও না; কারণ, তুমি ত জাননা, কোথায় তোমার দুর্বলতা? তোমার মনের অজানা অংশটাই যে বড়। তুমি এমন (normal personality) সুস্থ মানবের সহিত মধুর সম্বন্ধ স্থাপন কর, ভালবাসিয়া পূর্ণ বিশ্বাসে তাঁহার নিকট আত্ম-সমর্পণ কর, তাঁহার শরণ লইয়া জীবনের গোপন কথা, মর্মের ব্যথা তাঁহার কাছে উন্মুক্ত করিয়া

দাও,তাঁহার উপদেশের অনুসরণ কর, তিনি তাঁহার সহজ গভীর জ্ঞানে ও প্রেমে তোমাকে দিয়াই—তোমার অন্তর দিয়াই তোমার ব্যথিত অন্তরকে মুছাইয়া দিবেন। তোমার গ্রন্থিগুলি জাগিয়া উঠিয়া চিত্ত-বিশ্লেষককে কেন্দ্র করিয়া মনের এক অখন্ড ঐক্য-বোধ আনিয়া দিবে। এই যে গূঢ় পরিবর্তন, এটা হইবে তোমার ও চিত্ত-বিশ্লেষকের সহজ ব্যবহার ও কথোপকথনের মধ্য দিয়া; অবলীলাক্রমে, মাধুর্যের সরস-লীলার মধ্য দিয়া তোমার জীবন সার্থক হইয়া উঠিবে। এইরূপ চিত্ত-বিশ্লেষকের সহিত যোগ তোমার জীবনের পরিপূর্ণতারই দীক্ষা। তাই ফ্রয়েড্ বলিয়াছেন, "Analytic treatment is a sort of after-education"। চিত্ত-বিশ্লেষণ নূতন এক প্রকারের শিক্ষা—পরাবিদ্যা। ইহাতে আমাদের সমস্ত সত্তা নূতন ভাবে নিয়ন্ত্রিত হইয়া উঠে।

ব্যক্তিত্বকে বিকশিত করিবার আর এক প্রধান সহায় (Oedipus Complex) ঈডিপাস্ গ্রন্থি। মনের পূর্ণ স্বাস্থ্য লাভ করিতে হইলে নিরুদ্ধ গ্রন্থিগুলিকে জাগাইয়া তুলিতে হইবে। আমরা দেখিয়াছি, চিত্ত-বিশ্লেষকে একানুরক্তিতে মনের ভাবগুলি কেমন ঐক্যসূত্রে গ্রথিত হয়। কিন্তু পূর্বে আমরা এক অধ্যায়ে আলোচনা করিয়াছি, মূল ঈডিপাস্-গ্রন্থির নিরোধের ফলে আমাদের মনে ধীরে ধীরে কত শত গ্রন্থি দেখা দেয়, আর উহাদের দ্বন্দ্বেই আমাদের মনের বিপর্যয় ঘটে। কোন উপায়ে ঈডিপাস্ গ্রন্থিকে যদি মনে জাগ্রত রাখিতে পারি, তবে অন্যান্য প্রবৃত্তিগুলি উগ্ররূপে বৃদ্ধি পাইবার অবকাশ পায় না, জীবন বিকৃত হইয়া পড়ে না। আমরা দেখিয়াছি, শৈশবের ক্ষীণ কামনা চাঞ্চল্যহীন—প্রশান্ত, তাহাতে মায়ের সহিত একাত্ম-বোধ থাকিয়া যায়, তাই নিজের মাকে ভালবাসিলে জীবন সরল হয়, শান্ত হয়।

তীব্র মাতৃভক্তি থাকিলে আমরা জগতের প্রত্যেক নারীর উপর স্বতঃই ঐ ভাব আরোপ করি, জগৎ-ভরা মায়েরই প্রতিচ্ছবি দেখি। তখন আমাদের অন্য গ্রন্থিগুলি আর উগ্র বিকৃত রূপ ধরিতে পারে না। আমাদের অহঙ্কার থাকে না, অথচ বুদ্ধিমান্ হইয়াও আমরা সরল হই, কর্মী হইয়াও সহজ শান্ত থাকিতে পারি; মাকে কেন্দ্র করিয়া আমাদের জীবন শ্রদ্ধাময় কর্মবিচিত্র ও সার্থক হইয়া উঠে। এমনই মাতৃভক্তি দেখিতে পাই—প্রায় প্রতিভাবানেরই জীবনে।

কিন্তু অহঙ্কারটাই বলবান্ হইয়া উঠিলে মানুষ আর কাহারও প্রতি নির্ভর করিতে পারে না। তখন তাহার কর্ম সৃষ্টি করিতে পারে না—ধ্বংস-মুখী হয়। নেপোলিয়ানের প্রথম জীবন কেমন গরিমাময়! তখন জোসেফাইনের প্রতি তীব্র প্রেমে তিনি আত্মহারা; আবার যেই কূট রাজনীতির আশ্রয় লইয়া প্রিয়তমা জোসেফাইনকে ত্যাগ করিলেন, অমনই পদে পদে তাঁহার পরাজয় আরম্ভ হইল। অহং বাড়িয়া উঠিল—মনে নানা দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হইল। এমনই করিয়া মানুষ ধীরে ধীরে অকৃতজ্ঞ হইয়া পড়ে, গ্রন্থির দ্বন্দ্বে ও নিরোধে পরের উপকার বিস্মৃত হয়, মন বিকৃত হয়,—ধীরে ধীরে অমোঘ নিয়মের বশে ধ্বংস আসিয়া দেখা দেয়। ইহার ঠিক বিপরীত দেখিতে পাই—অশোকের জীবনে। বৌদ্ধ শ্রমণকে কেন্দ্র করিয়া তাঁহার অহং-বিকার দূর হইল, অমনি কোন্ যাদুকরের মন্ত্রবলে যেন চণ্ডাশোক ধর্মাশোকে রূপান্তরিত হইল। তেমনই রাণা প্রতাপের কেন্দ্রহীন গুরুঘাতী জীবন নানা দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়া শুধু অকৃতার্থতাই ডাকিয়া আনিল,—আর দস্যুসর্দার শিবাজী গুরু রামদাসকে কেন্দ্র করিয়া ভারতে মহারাষ্ট্র জাতির সৃষ্টি করিলেন। এই সহজ instinctive প্রাণের টান যাঁহাদের জীবনের মূল উৎস তাঁহারাই শ্রেষ্ঠ—প্রতিভাবান—মানব-সংঘের নেতৃস্থানীয়।

"তাঁহারা rational being secondarily, কিন্তু তাঁহাদের চালনার নিয়ামক হচ্ছে এই অহৈতুক সহজ instinctive প্রাণের টান।" আবার আমরা দেখিতে পাই, যাহার Psycho-Sexual Attachment বা প্রেম যত তীব্র আর ঐ প্রেমের পাত্র যত আদর্শস্থানীয় তিনিই জীবনে তত বড় হইয়াছেন। পর-পরিচ্ছেদে আমরা আদর্শ চিত্ত-বিশ্লেষক সম্বন্ধে আলোচনা করিব।

⁂

চতুর্দশ পরিচ্ছেদ

আদর্শ চিত্ত-বিশ্লেষক

(Ideal Psycho-analyst)

আমরা মনের অখন্ড ঐক্যের কথা বার বার বলিয়া আসিয়াছি, কিন্তু এই ঐক্য কি, এ সম্বন্ধে আমাদের কোন সুস্পষ্ট ধারণা নাই। এইবার আমরা প্রসিদ্ধ মনস্তত্ত্ববিৎ জেম্‌স্ এর বাণীর মধ্য দিয়া এই কথাটিকে স্পষ্ট করিয়া বুঝিতে চেষ্টা করিব। জেম্‌স্ তাঁহার মনোবিজ্ঞানে বলিয়াছেন, আমাদের অনেক জগৎ আছে—কবির জগৎ, বৈজ্ঞানিকের জগৎ, উন্মাদের জগৎ, প্রতি মানবের ব্যক্তিগত জগৎ, খৃষ্টিয়ানের জগৎ, মুসলমানের জগৎ, উপকথার জগৎ—এমন অসংখ্য জগৎ আছে। আবার অগণিত জগতের মধ্যে যেটি বা যে কয়টি আমরা প্রাণ দিয়া উপলব্ধি করিতেছি, সেই কয়টিই আমাদের সত্যিকার জীবন্ত জগৎ হইয়া উঠিতেছে। আর বাকীগুলি আমাদের কাছে মিথ্যা, নিরর্থক বলিয়াই মনে হয়। শিশুর জগৎ তাহার নিকট জ্বলন্ত সত্য বলিয়া বোধ হইলেও আমি যৌবনে পদার্পণ করিয়াছি, আমার নিকট শিশুর খেলাধূলা উপকথা সমস্তই অকিঞ্চিৎকর—নিরর্থক—মিথ্যা। এমনই অগণিত জগতে আমরা বাস করিতেছি, আর পরস্পরের সঙ্গে একটা আপোষ করিয়া নিশ্চিন্ত মনে জীবন যাপন করিতেছি; কিন্তু সমস্যা এই, এত জগতের মধ্যে, রূপ-রস শব্দ-গন্ধ-স্পর্শের এই বিরাট প্রবাহের জটিলতার মধ্যে অখন্ড ঐক্য কোথায় খুঁজিয়া পাইব? জেমস বলিয়াছেন, আমাদের বিচিত্র অনুভূতি যাঁহার বোধের মধ্যে সার্থক হইয়া উঠিয়া এক মহান ঐক্য লাভ করিবে তিনিই (Soul of the world) বিশ্বাত্মা। জগতের বিচিত্র

জ্ঞান ও ঘটনা-স্রোত তাঁহারই মধ্যে গভীর অথচ সরল সামঞ্জস্য লাভ করিবে, আর বিশ্বাস স্থাপনের একমাত্র আদর্শ ইহাই। আর ঐরূপ কিছু সন্তোষ-জনক রূপে উদ্ভাবিত হইলে মানবজাতি অন্য সমস্ত বিসর্জন দিয়া ঐ আদর্শকেই সত্য বলিয়া আঁকড়াইয়া ধরিবে।

আবার দার্শনিক, অয়কেন্ বলিয়াছেন,—"A genuine self is constituted only by the coming to life of the infinite spiritual world in an independent Concentration in the individual" সত্য আদর্শ তখনই গড়িয়া উঠে, যখন অসীম বিশ্বাত্মা স্বাধীন ইচ্ছায় নিজেকে সংহত করিয়া ব্যক্তিত্ব লইয়া জীবন্ত হইয়া উঠেন। আর মানুষকে চরম আশার বাণী দিয়াছেন অয়কেন। তিনি বলিয়াছেন, "Man does not merely enter into some kind of relation with the spiritual life, but finds his own being in it." মানুষ বিশ্বাত্মার সহিত যোগ-স্থাপনাই শুধু করে না, তাহার সহিত একাত্মতাই উপলব্ধি করে। এইরূপ ব্যক্তিই আদর্শ চিত্ত-বিশ্লেষক। তাঁহার মনে কোন দ্বন্দ্ব নাই বলিয়া (homogeneus) অখন্ড ; জেম্স্ এর ভাষায় তিনি (Soul of the world) বিশ্বাত্মা, অয়কেনের ভাষায় তিনি (Wonder of wonders) মানবের পরম বিস্ময়। আমরা পূর্ব পরিচ্ছেদে দেখিলাম, ক্রমাভিব্যক্তির মধ্য দিয়া পারিপার্শ্বিক জগতের প্রতিচ্ছবি অন্তরে লইয়া আমরা মানুষ হইয়া উঠিয়াছি। আমাদের অব্যক্ত মনে তাই সমগ্র জগতের ছাপ রহিয়াছে। আদর্শ চিত্ত-বিশ্লেষক তিনিই যাঁহার অব্যক্ত মনের সমস্ত ভাব জাগ্রত মনের সহিত সমন্বয় লাভ করিয়াছে,—যাঁহার মধ্যে জানা ও অজানার ব্যবধান ঘুচিয়া গিয়াছে। মানুষ তাঁহার সংস্পর্শে আসিলে তাঁহার প্রতি অনুরক্ত হয়, একটা (Psycho-sexual Attachment) তীব্র

প্রেম জাগিয়া উঠে, আর মানুষের আজন্ম-সঞ্চিত বিচিত্র গ্রন্থি তাঁহাকেই কেন্দ্র করিয়া আদর্শ সমন্বয় লাভ করিতে পারে।

যা' ছিল দার্শনিকের দার্শনিকতা আজ তাহা বিজ্ঞানসম্মত সত্যে পরিণত হইয়াছে, যা ছিল মাত্র সাধকের বা চিন্তাশীলের সাধনার ধন, আজ তাহা সর্বসাধারণের বোধে নামিয়া আসিয়া সবার কাছে ধরা দিয়াছে। বৈজ্ঞানিক নোবেল লরিয়েট্ ডাক্তার এলেক্সিস্ ক্যারেল্ তাঁহার বিখ্যাত "Man the Unknown" পুস্তকে বলিতেছেন, "Among the multitude of the weak and defective there are, however, some completely developed men. These men, when closely observed, appear to be superior to the classical schemata. In fact, the individual whose potentialities are all actualized does not resemble the human being pictured by the specialists. He is not the fragments of consciousness which psychologists attempt to measure. He is not to be found in the chemical reactions, functional processes, and the organs which physicians have divided between themselves. Neither is he the abstraction whose concrete manifestations the educators try to guide. He is almost completely wanting in the rudimentary being manufactured by social workers, prison wardens, economists, sociologists and politicians. In fact, he never appears to a specialist unless this specialist is willing to look at him as a whole. He is much more than the sum of all the facts accumulated by the particular sciences. We never apprehend him in his entirety. He contains vast unknown regions. His potentialities are almost inexhaustible. Like the great natural phenomena, he is still unintelligible. When one contemplates him in the harmony of all his organic and spiritual activities, one experiences a profound aesthetic emotion. Such an individual is truly the creator and the centre of the universe."

"অগণিত দুর্বল ও বিকৃত মানবের মধ্যে মাঝে মাঝে এক একজন পূর্ণপরিণত মানবের আবির্ভাব হয়। এদের সূক্ষ্মভাবে পর্য্যবেক্ষণ করিলে মনে হয় এরা সাধারণ মানুষ হইতে উচ্চস্তরের। বাস্তবপক্ষে সে অসাধারণ ব্যক্তির অন্তর্নির্হিত শক্তিসমূহ তাঁহার জীবনে ও চরিত্রে মূর্ত বিকশিত হইয়া ওঠে, সে মানুষের সহিত কোন বিশেষজ্ঞের মনগড়া ছবি কখনও মিল খায় না। তিনি মনোবৈজ্ঞানিকের হিসাবের মাপকাঠিতে ধরা পড়েন না। বৈজ্ঞানিকের বিশ্লেষণ-বুদ্ধি তাঁহার সন্ধান পায় না। রাজনৈতিক তাঁহার সন্ধান জানে না, সমাজতত্ত্ববিৎ বা অর্থনৈতিক তাঁহাকে নিজের বুদ্ধির মাপকাঠিতে ধরিতে পারে না। তিনি কোন বিশেষজ্ঞের কাছেই ধরা দেন না, যদি না কোন বিশেষজ্ঞ তাঁহাকে সমগ্রভাবে উপলব্ধি করিতে উদগ্রীব হয়। অমনতর একজন অদ্ভুত মানুষ জগতের সর্ববিধ বিজ্ঞানশাস্ত্রের সব সত্যিকে অতিক্রম করিয়া স্বমহিমায় বিরাজ করেন। আমরা সেই ভাগবত মানুষকে সমগ্রভাবে কখনই ধারণায় আনিতে পারি না। তাঁহার ভিতরে মানবের অজ্ঞাত কত কত জিনিষ থাকে। তাঁহার অন্তর্নিহিত শক্তি অফুরন্ত। বিরাট প্রাকৃতিক দৃশ্যের মত তাঁহাকে বুঝিয়াও বোঝা যায় না—চিরপ্রহেলিকাময়, চির-অবোধ্য! মানব যখন তাঁহার সর্ববিধ শক্তির অপূর্ব সঙ্গতির বিষয় চিন্তা করে, তাহার মনে স্বতঃই গভীর ভক্তি-শ্রদ্ধামিশ্রিত অপূর্ব সম্বেগের আবির্ভাব হয়। এমনধারা ব্যক্তিই সত্যি সত্যি বিশ্বের কেন্দ্র ও বিশ্বস্রষ্টা।"

সাধারণ মানুষ যাহারা মূঢ়, তাহারা তাঁহাকে চিনিতে পারে না, অবজ্ঞা করে, তাই ভাগবত-মানব শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছিলেন—

"অবজানন্তি মাং মূঢ়া মানুষীং তনুমাশ্রিতম্।
পরং ভাবমজানন্তো মম ভূতমহেশ্বরম্।।"

আমার ভূতমহেশ্বর পরভাব না জানিয়া যাহারা মনুষ্যদেহধারী আমাকে অবজ্ঞা করে তাহারা মূঢ়। শ্রীকৃষ্ণ প্রভৃতি ভাগবত মানবগণ, ফ্রয়েডপ্রমুখ চিত্ত-বিশ্লেষকগণ তাই জগতে চিরদিনই বহুধা নিন্দিত, নির্যাতিত, অবমানিত।

এই কথাটাকে লইয়া এতটা বিস্তারের একটা উদ্দেশ্য আছে। অনেকে হয়ত ভাবিতেছেন, ধান ভানিতে ভানিতে শিবের গীত কেন? কিন্তু নূতন বিজ্ঞানের প্রবর্তক ফ্রয়েড় বলিতেছেন, "Mis-use of Psycho-analysis is possible in various ways; above all, transference is a dangerous remedy in the hands of an un-conscientious Physician." অর্থাৎ নানা প্রকারে চিত্ত-বিশ্লেষণের অপব্যবহার সম্ভবপর; বিশেষতঃ অবিবেকী চিকিৎসকের হাতে পড়িলে এই প্রেমের সম্বন্ধ-স্থাপনা অতীব বিপজ্জনক। কারণ, যিনি চিত্ত-বিশ্লেষক হইবেন, তাঁহার মন সম্পূর্ণ সুস্থ, ধীর হইবে। তবেই তিনি অপরের মনের পরিবর্তন সাধন করিতে পারিবেন। অভিজ্ঞ চিকিৎসক না হইলে চিকিৎসক ও রোগী উভয়েরই ঘোর বিপদের সম্ভাবনা। অনেক সময় রোগীর ব্যাধি দূর করিতে গিয়া চিত্ত-বিশ্লেষকের মনের নিরুদ্ধ গ্রন্থি জাগিয়া উঠে, রোগীর সহিত বিকৃত সম্বন্ধ স্থাপিত হয়, উভয়েই তখন বিকারগ্রস্ত হইয়া পড়ে। অনেক ক্ষেত্রে রোগী হয়ত সারিয়া উঠিল, চিকিৎসক বিকৃত-মস্তিষ্ক অথবা চরিত্রহীন হইয়া পড়িল। হ্যাম্‌ব্লিন স্মিথ্ বলেন, "A great difficulty in Phycho-analysis is that the analyst has a

trouble in penetrating into the mind of another, because he has not yet passed the barriers which exist between his own conscious-ness and unconscious-ness. Until the barriers between his own minds have passed, the would-be examiner has not the qualifications necessary to see into the un-conscious mind of another. He does not wish to see those elements in the other's mind which have been repressed into his own unconscious-ness. We are but beginning to use the sounding line and we are just commencing to realise what the depth really is." নিজের ব্যক্ত ও অব্যক্ত মনের ব্যবধান দূর করিতে না পারিলে অপরের মনের মধ্যে প্রবেশ করা বিশ্লেষকের পক্ষে অতীব কষ্টসাধ্য। ইহাই চিত্ত-বিশ্লেষণের মহাসমস্যা। যে পর্যন্ত নিজের মনের এই ব্যবধান অপসারিত না হইবে সে পর্যন্ত পরীক্ষক অপরের অব্যক্ত মন জানিবার অধিকারী হইবেন না। তাঁহার নিজের অব্যক্ত মনে যে গ্রন্থিগুলি নিরুদ্ধ রহিয়াছে, অপরের মনের সেই গ্রন্থিগুলি তিনি দেখিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করেন। আমরা মনের গভীরত্ব মাপিতে আরম্ভ করিয়াই বুঝিতে পারিতেছি, কত অতল-স্পর্শ আমাদের মন! আবার ফ্রয়েড্ বলিতেছেন, "This excellent method is, of course, only practicable for one person, never for an entire class." চিত্ত-বিশ্লেষণের এই চমৎকার পদ্ধতি বহুর জন্য নয়, একজনই মাত্র ইহাতে সম্পূর্ণরূপে কৃতকার্য হইতে পারেন। তাই, আমরা আদর্শ চিত্ত-বিশ্লেষকের প্রসঙ্গ তুলিলাম। তিনি নিজে অবিকৃত থাকিয়া মনুষ্যের শক্তি ও শান্তি ফিরাইয়া আনিতে পারেন। তাঁহার মন পূর্ণ; তাই, বিচিত্র মানবের সংস্পর্শে আসিলেও তিনি নির্লিপ্ত থাকিতে পারেন, আর অসীম প্রেম তাঁহার স্বভাবগত বলিয়া তাঁহার

সহিত প্রতি মানুষেরই মধুর সম্বন্ধ সহজভাবে সত্বর বাড়িয়া উঠিতে পারে।

যেখানে জীবনের সঙ্গে জীবনের গূঢ় যোগের মধ্য দিয়া মানুষের অন্তর জাগ্রত করিয়া তাহার পূর্ণস্বাস্থ্য ফিরাইয়া আনিতে হইবে সেখানে একদিকে যেমন পূর্ণত্ব, অন্যদিকে আবার উভয়েরই ঘোর বিপদের সম্ভাবনা। ভারতে একদিন ইহার অনুরূপ আর্যপদ্ধতি প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিল; তাহাতে সমাজ যেমন লাভবান্ হইল, আবার ইহার কুফলও তেমনই উগ্ররূপ ধারণ করিল। একদিকে যেমন অন্তর্বিৎ চিত্ত-বিশ্লেষকের সহিত মিলনে শিক্ষার্থীর অন্তর নিয়ন্ত্রিত হইত, সমাজে চরিত্রবান্ দৃঢ় ব্যক্তিত্ব গড়িয়া উঠিত, অন্যদিকে অপক্ক স্বার্থান্ধ মানবের প্রতারণায় তেমনই ব্যভিচারের স্রোত বহিল। সমাজের স্বাস্থ্যও বিকৃত হইয়া পড়িল। আলোর নীচেই ছায়া। যাহা মানবের চরম উন্নতির একমাত্র আদর্শ পন্থা, তাহার ব্যভিচারে মানুষ অসুস্থ—বিকৃত হইয়া পড়ে। আমরা আজ এই পদ্ধতিকে ভীতির চক্ষে দেখি, আর তাই ধীরভাবে বিচার করিতে না পারিয়া ইহার দোষ হইতে দূরে থাকিতে গিয়া ইহার অবশ্যম্ভাবী মহা সুফল হইতেও বঞ্চিত হইতেছি। কিন্তু সুস্থ থাকিতে হইলে—অন্তরের সম্পদ্ বাড়াইতে হইলে ও অসুস্থতার হাত হইতে পরিত্রাণ পাইতে হইলে প্রতি মানবেরই আদর্শ চিত্ত-বিশ্লেষকের (Ideal Psycho-analyst) সহিত যথাসাধ্য যোগ স্থাপন জীবনের প্রধান কর্তব্য—আধুনিক মনোবিজ্ঞানের ইহাই শেষ বাণী। তাঁহার প্রতি অনুরাগই আমাদের জীবনের পাথেয়। কি করিয়া এই অনুরাগের বন্ধন দৃঢ় করিতে পারি, তাহাই আমরা পর-পরিচ্ছেদে বিশেষভাবে আলোচনা করিব।

⁂

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

পথের পাথেয়

যাহা আমাদের ভাল লাগে, তাহাতেই আমাদের মন লাগে,—আমরা একাগ্র হই। তাই জেম্‌স্‌ বলিয়াছেন, “What we attend to and what interests us are synonymous terms.” মন-লাগা আর ভাল-লাগার একই অর্থ। আবার ভাল-লাগার চরম ভালবাসায়—প্রেমে। প্রেমে মন একাগ্র হয়—আবেগময় হইয়া উঠে; আর, একাগ্রতায় ইচ্ছা-শক্তির উদ্বোধন হয়, কর্মের প্রেরণা আনিয়া দেয়। তাই আধুনিক মনোবিজ্ঞান প্রেমের মহিমা ঘোষণা করিতেছে। আবার বাহিরের কোন বস্তুকে আশ্রয় না করিলে মনে আবেগের (emotion) উদয় হয় না—অন্তরের বিকাশ হয় না। তাই মনীষী জেম্‌স্‌ বলিয়াছেন, “All our inward images tend invincibly to attach themselves to some thing sensible so as to gain in corporeity and life. As soon as any one of these stands for the idea, the latter seems to be more real.” আমাদের ভিতরের সমস্ত ছবিগুলি তখনই জীবন্ত—মূর্ত হইয়া উঠে, যখনই বাহিরের কোন ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য পদার্থের সহিত উহারা যুক্ত হয়। বাহিরের কোন বস্তুকে প্রতীকরূপে ধরিলে মনের ভাবগুলি আরও সত্য হইয়া উঠে। আর এক স্থানে তিনি বলিতেছেন, “Strange mutual dependence is this, in which the appearances need the reality in order to exist but the reality needs the appearance in order to be known.” ইহা এক অপরূপ বন্ধন যেখানে বহির্জগৎ অন্তর্নিহিত কারণের উপরই দাঁড়াইয়া রহিয়াছে, অথচ সেই কারণকে, সত্য বস্তুকে জানিতে হইলেই বহির্জগতের মধ্য

দিয়া আমাদের অগ্রসর হইতে হয়। এখন আমাদের মনের ধারণাগুলিকে জীবন্ত মূর্ত করিতে হইলে, জেম্‌স্‌ বলিয়াছেন, চাই বাহিরের জগতের কোন প্রতীককে অবলম্বন করা। তাই, আদর্শ চিত্ত-বিশ্লেষককে প্রতীক করিলেই, তাঁহার প্রতি অনুরাগ হইলেই আমরা মনুষ্যত্বের পূর্ণ পরিণতির দিকে অগ্রসর হইতে পারি। কারণ, পূর্বেই বলিয়াছি, জল-স্থল, আকাশ-বাতাস, গাছ-পালা, জীব-জন্তু আমাকে মুগ্ধ করিয়াছে সত্য, কিন্তু আদর্শ চিত্ত-বিশ্লেষকই আমার নিকট—সর্বমানবের নিকট পরম-বিস্ময়; কারণ তাঁহার দেহ-মনের মধ্যে—অয়কেনের ভাষায় আবার বলিতে গেলে—অসীম বিশ্বাত্মা স্বাধীন ইচ্ছায় সংহত হইয়াছেন। ক্যারেলের ভাষায় বলিতে গেলে "Such an individual is the creator and the centre of the universe." ঐ মানুষই বিশ্ব-স্রষ্টা, বিশ্বের কেন্দ্র। কোন প্রাচীন যুগে, তাই বুঝি, মহামতি প্লেটো বলিয়াছিলেন যে—"If I should have a man who could detect the one in many, I would follow him as a God." অর্থাৎ, "যদি আমি এমন কাহাকেও পাইতাম যিনি বহুর মধ্যে একের সত্তা নির্ণয় করিতে সমর্থ, তাহা হইলে দেবতার ন্যায় তাঁহার অনুসরণ করিতাম।" সর্বদেশে সর্বকালে আমরা এরূপ আদর্শ খুঁজিয়া পাই না; তখন সে যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ জীবিত চিত্ত-বিশ্লেষকের (The ideal personality or psycho-analyst of the age) সহিত যুক্ত হইলে আমরা জীবনের চরম সার্থকতা লাভ করি।

কিন্তু তাঁহার প্রতি অনুরাগ বাড়াইব কেমন করিয়া? আমরা দেখি, তাঁহার দেহের মধ্য দিয়াই আমরা তাঁহাকে অনুভব করি; তাঁহার রূপ, তাঁহার কথা আমাদের মনে আনন্দ সঞ্চার করে। এই

অনুভূতিগুলির উপর একাগ্র হইতে পারিলেই তিনি আমাদের নিকট অধিক জীবন্ত মূর্ত্ত হইয়া উঠেন। তাঁহার দেহই তাঁহার স্থূল প্রকাশ। আর একান্ত অনুরাগে তাঁহার রূপ আমাদের মনে লাগিয়া থাকে; কারণ, অনুরাগের আরম্ভ হয় রূপের মধ্য দিয়া। তাই, যত গভীরভাবে তাঁহার রূপে আমাদের মন নিরন্তর লাগিয়া থাকে, তাঁহার সম্বন্ধে বিচিত্র অনুভব আমাদের ততই বাড়িতে থাকে।

আবার দেহের পশ্চাতে রহিয়াছে মন। আদর্শ চিত্ত-বিশ্লেষক মনের তলদেশ পর্যন্ত উপলব্ধি করিয়া এক অখন্ড ভাবের মধ্যে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। মনের যে মূলদেশে তিনি পৌঁছিয়াছেন, তাহারও কোন প্রতীক অনুক্ষণ মনন করিলে আমাদের মন সেই ভাবে স্পন্দিত হইতে থাকিবে। এইরূপে তাঁহার দেহ-মনের চিন্তায় একাগ্র হইলে আমাদের মন স্বভাবতঃই সর্ব-সংস্কারমুক্ত হইয়া চিত্ত-বিশ্লেষকময় হইয়া উঠিবে; এমনই করিয়া একান্ত প্রেমে তাঁহার মধ্য দিয়াই আমার আমিত্বকে পূর্ণরূপে জানিতে পারি এবং বিশ্বের সঙ্গে আমার নিগূঢ় যোগ অন্তর দিয়া উপলব্ধি করিতে পারি।

আবার বাহিরের কোন বস্তুতে আকৃষ্ট হইলে আমরা প্রথম তাহা অনুভব করি; তারপর সেই বস্তু সম্বন্ধে আমরা চিন্তা করি,—আর এই অনুভব ও চিন্তার মধ্য দিয়াই আমাদের কর্ম-প্রবৃত্তি জাগিয়া উঠে। ধরুন, আমি আপনাকে ভালবাসিয়াছি। আপনাকে ভাল লাগিল—আপনার সম্বন্ধে চিন্তা করিলাম, আর সঙ্গে সঙ্গে আপনার জন্য কর্ম করা আমার পক্ষে স্বাভাবিক হইয়া উঠিল। এখন, আপনার প্রতি অনুরাগ বাড়াইতে হইলে আমার আপনাকে বোধ করা, আপনার জন্য চিন্তা করা ও আপনার জন্য কর্ম করা প্রয়োজন। আর যতখানি ও যেমনতর এইগুলি আসিবে, আপনার প্রতি আমার অনুরাগও

ততখানি, তেমনতর বাড়িতে থাকিবে। এমনই করিয়া কোন বস্তুকে আমরা ভালবাসিয়া জ্ঞান, প্রেম ও কর্মের মধ্য দিয়াই তাহাকে অখন্ডভাবে উপলব্ধি করিতে পারি। তখন আমরা খন্ড খন্ড করিয়া জানি না। তাই ফ্রয়েড্ বলিয়াছেন, আমাদের প্রচলিত শিক্ষা ও সংস্কারগুলিই আমাদের জ্ঞানের অন্তরায়। আমরা কোন বস্তুকে অস্ত্র দ্বারা ব্যবচ্ছেদ করিয়া দেখিতে যাই, প্রচলিত বিজ্ঞানের চশমা পরিয়া বুঝিতে চেষ্টা করি। কিন্তু সমস্ত সত্তা দিয়া উপলব্ধি করিবার জন্য আমরা মোটেই ব্যাগ্র হই না, বুঝিতে পারি না—অন্তর দিয়া উপলব্ধি করাই চরম উপলব্ধি। আর এমনই করিয়া আমরা বহু জিনিষই হারাই।

⁂

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

চিত্ত-বিশ্লেষণের ভবিষ্যৎ

মানব-সভ্যতার দিকে তাকাইলে দেখি, যুগে যুগে এমনই জীবন্ত আদর্শ (Normal personality) আমাদের স্বাস্থ্য দিয়াছেন, আনন্দ বাড়াইয়াছেন, অন্তরের রুদ্ধ শক্তি বাধামুক্ত করিয়াছেন। যীশু আসিয়াছিলেন এমনই অন্তরের সম্পদ লইয়া যে, দারিদ্র্যের বিরলতার মধ্যে থাকিয়াও কয়েকটি সাধারণ নীচজাতীয় মানুষকে এমন মানসিক স্বাস্থ্য দান করিয়া গেলেন যে আজ পর্যন্ত খৃষ্টীয় সমাজে তাঁহাদের উপ্ত বীজ উদ্ভিন্ন হইয়া বিচিত্র সৃষ্টিতে জগৎ মুগ্ধ করিতেছে। যীশুর মূলমন্ত্র ছিল—বিশ্বাস, প্রেম, অনুতাপ ও পাপ-স্বীকার। তিনি বলিতেন, "আমাকে ভালবাস, আমাকে আত্মসমর্পণ কর, বিশ্বাস কর, অতীত পাপের জন্য অনুতপ্ত হও, আর মর্মের ব্যথা আমাকে দাও—আমি তোমাদের মানব-জাতির নিয়ন্তা করিয়া দিব, "I shall make you fishers of men." তাঁহার সহিত প্রেমের (Psycho-sexual attachment) যোগে তাঁহার মুষ্টিমেয় অনুচর পাশ্চাত্য জগতে কি প্রেম ও শক্তির প্লাবন আনিয়াছিল, তাহা খৃষ্টীয় ধর্ম-ইতিহাসের পাঠকমাত্রেই অবগত আছেন। আজ আধুনিক মনোবিজ্ঞানের আলোকে দেখিতে পাইতেছি, যীশুর বাণী কতখানি অন্তরের গূঢ় রহস্যপূর্ণ।

নেপোলিয়ান যে অগণিত মানবের উপর অবাধ কর্তৃত্ব করিয়া তাহাদের জীবন নিয়ন্ত্রিত করিয়া গিয়াছেন, তাহারও মূলে রহিয়াছে মনেরই শক্তি। সেনাপতিগণ নেপোলিয়ানকে প্রাণ অপেক্ষা ভালবাসিতেন। নেপোলিয়ানে একানুরক্তিতেই তাঁহারা অদ্ভুত বীর্য্যের অধিকারী হইতে পারিয়াছিলেন। নেপোলিয়ান ছিলেন অন্তর্বিৎ; তাই

সেনাগণকে মুগ্ধ করিয়া স্বেচ্ছায় প্রাণত্যাগের জন্য আত্ম-হারা করিয়া তুলিতে পারিতেন।

আবার বুদ্ধ, মহম্মদ, কবীর, নানক প্রমুখ মহাপুরুষগণ আদর্শ চিত্ত-বিশ্লেষক ছিলেন; উহাদের মধ্যে যিনি মনের তলদেশ যতখানি উপলব্ধি করিয়াছিলেন, তিনি মানবের অন্তরকে ততখানি নিয়ন্ত্রিত করিয়া গিয়াছেন। তাঁহারা কবে দেহত্যাগ করিয়াছেন, আজও তাঁহাদেরই কেন্দ্র করিয়া মানুষ শ্রদ্ধায়, প্রেমে ও কর্মে জীবনযাত্রাকে সার্থক করিয়া তুলিতেছে।

ঐন্দ্রজালিকের মত যুগ-যুগসঞ্চিত অজ্ঞতা ও কুসংস্কারজাল ভেদ করিয়া মানবের অদৃষ্টকে তাঁহারা দৃষ্ট করেন, অজ্ঞাতকে তাঁহারা জানাইয়া দেন, পুরুষকারের প্রসার বাড়াইয়া দেন; তাই দিকে দিকে কর্ম ও চিন্তার প্রবাহ বহিতে থাকে। কোন কৃত্রিম অনুষ্ঠান-পদ্ধতির জটিলতা লইয়া তাঁহারা আসেন না, অনাড়ম্বর নিরালা জীবন যাপন করিয়া অন্তর-রাজ্যে অবগাহন করিয়া তাঁহারা মনুষ্যত্বের মূল উৎসের বার্ত্তা বহন করিয়া আনেন। এমনই করিয়া তাঁহারা আদর্শ চিত্ত-বিশ্লেষক হন এবং সর্ব-মানব তাঁহার সংস্পর্শে আসিলেই মুক্তির আনন্দের আভাস পাইয়া থাকে। তিনি মানুষের বিচিত্র কর্ম-প্রবাহে দিগ্‌ভ্রান্ত হইয়া অপ্রধানকে প্রধান বলিয়া আঁকড়াইয়া ধরেন না, জগতের অন্তর্নিহিত কারণকে সমগ্র সত্তা দিয়া উপলব্ধি করিয়া বিশ্বকে কারণ-মুখী করিতে চেষ্টা করেন। বহু-গ্রন্থিযুক্ত ব্যাধিগ্রস্ত মানবের মন তাঁহার অনাড়ম্বর মন বুঝিয়া উঠিতে পারে না, অকুণ্ঠিত চিত্তে তাঁহাকে গ্রহণ করিতে পারে না। শিশুকে একটি বীজ দিলে সে বুঝিতে পারে না ঐ বীজ হইতে প্রকান্ড বৃক্ষ জন্মিবে কেমন করিয়া, অজ্ঞকে একটু ডাইনামাইট্‌ (Dynamite) দিলে সে বুঝিতে

পারে না—ঐটুকুর মধ্যে প্রচন্ড শক্তি কেমন করিয়া লুকাইয়া থাকিতে পারে!

আদর্শ চিত্ত-বিশ্লেষক স্বীয় জীবনের আদর্শ, লোকসমাজের সম্মুখে ধরিয়া প্রেম, বিশ্বাস, অনুতাপ ও পাপ-স্বীকারের অমৃত মন্ত্র অকুণ্ঠিত চিত্তে ঘোষণা করিয়া যান, মানুষকে অন্তরের অধিকারী করিয়া তুলেন। এমনই করিয়া তিনি মানবের মনে স্বাস্থ্য ও শক্তি ফিরাইয়া আনেন। আর তাঁহাকে কেন্দ্র করিয়া মানুষের সমাজ, সাহিত্য, শিক্ষা, রাষ্ট্র, শিল্প, কলা, বিজ্ঞান, বাণিজ্য সমস্ত দিকে নূতন জীবনের সাড়া পড়িয়া যায়। কারণ, অন্তরের সম্পদের অধিকারী হইলেই নানা কর্মক্ষেত্রে মানবের অন্তর দুই কূল ছাপাইয়া উচ্ছসিত হইয়া পড়ে। ঐরূপ আদর্শের সংস্পর্শে মানুষের অন্তর-রাজ্যের গূঢ় নিয়ম করায়ত্ত হইলে মানবসঙ্ঘ নূতনভাবে নিয়ন্ত্রিত হয়; তাই, সমাজ সুস্থ ও সুন্দর হইয়া উঠে। অন্তরের গোপন-তলের রহস্য উদঘাটিত হয়; তাই মানবচরিত্রের বৈচিত্র্য সাহিত্য, শিল্প, কলার সরস সৃষ্টির মধ্য দিয়া মূর্ত্ত হইয়া উঠে। অন্তরে প্রবৃত্তির বিক্ষোভ চলিয়া যায়, মন একমুখী হয়, স্বার্থের সংঘাত কমিয়া যায়; তাই, রাষ্ট্র ও বাণিজ্য শান্তি ও কল্যাণে বিভূষিত হয়। বহু চিত্ত-বিশ্লেষকের সৃষ্টি হয়, শিক্ষায় নূতন আদর্শ প্রবর্তিত হয়; আদর্শ শিক্ষকের সংস্পর্শে যুবকগণ জ্ঞানে ও চারিত্র্যে মন্ডিত হয়, তাহাদের সুস্থ মনে ইচ্ছাশক্তির স্ফূরণ হইতে থাকে। মানবাত্মার জয়গানে দিগ্বিদিক্ ধ্বনিত হইয়া উঠে।

চিত্ত-বিশ্লেষণের উন্নতি ও প্রসারণের সঙ্গে সঙ্গে আমরা বুঝিতে পারিব যে আমাদের আজীবন সুস্থ ও শক্তিমান থাকিবার চেষ্টা করিতে হইবে। আর, মানুষের কর্তব্য, শুধু অসুস্থতার হাত হইতে রক্ষা পাওয়া নয়, নিজের শক্তি বাড়াইয়া ব্যক্তিগত, সামাজিক ও

জাতীয় জীবনকে উন্নত করা। আমরা এতদিন শুধু জানিতাম, যে-জাতি যত বাণিজ্য সম্ভার উৎপন্ন করে, সেই জাতি তত সমৃদ্ধ। আজ পাশ্চাত্য মনোবিজ্ঞান আমাদের অন্তরের রুদ্ধ দ্বারে করাঘাত করিয়া বলিতেছে—'মানুষ, তোমার সমস্ত প্রচেষ্টার মূলে তোমার মন। মনের দ্বারাই তুমি বহিঃপ্রকৃতি জয় করিতেছ, মনের দ্বারাই তুমি অন্তঃ-প্রকৃতিকে বশীভূত কর, তোমার জীবনের অন্তস্তল ভেদ কর; তবেই তুমি বিশ্বকে জয় করিবার সামর্থ লাভ করিবে।' তাই, আজ বুঝিতেছি, যে জাতির শিক্ষায়, রাষ্ট্রে, বিজ্ঞানে, বাণিজ্যে, সমাজে সর্বক্ষেত্রেই যত অন্তর্বিদের সংখ্যা বাড়িয়া যাইবে, সেই জাতি তত সমৃদ্ধিশালী হইয়া উঠিবে। এমনই করিয়া অন্তরের সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত হইয়া বাহির ও ভিতরের সমন্বয় করিয়া বিশ্ব-মানবের মহামিলন ক্ষেত্র রচনা করাই বর্তমান যুগের চরম আদর্শ; আর ইহাই আধুনিক মনোবিজ্ঞানের গূঢ় ভবিষ্যদ্‌বাণী, আর এই মহামিলনের একমাত্র আর্য-পন্থা—আদর্শ চিত্ত-বিশ্লেষকের সহিত প্রাণের নিবিড় যোগ। তাই কি গীতায় পার্থ-সারথি বলিয়াছেন—

"নাস্তি বুদ্ধিরযুক্তস্য ন চাযুক্তস্য ভাবনা।
ন চাভাবয়তঃ শান্তিরশান্তস্য কুতঃ সুখম্।।"

তোমার যদি অমনধারা মানবের সহিত জীবনে যোগই না ঘটিল, তবে তোমার বুদ্ধিই গজাইবে না,—আর ঐ যোগ না হইলে তুমি ভাবিবেই বা কি, আর তোমার শান্তি আর সুখই বা আসিবে কোথা হইতে?

* * *